বোলসেভিকি

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

আত্মশক্তি লাইব্রেরী
১৫নং কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীবরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
আত্মশক্তি লাইব্রেরী,
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
আষাঢ়, ১৩৩৮
দাম বার আনা

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার
ক্লাসিক প্রেস
২১।৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মুখবন্ধ।

বর্ত্তমান প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছে একটি বিশেষ ভাবকে আশ্রয় করিয়া। সেই ভাবটির প্রথম কথা এই—পরধর্ম্ম ভয়াবহ। আমরা ভরতবাসীরা এত অনুকরণপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছি যে পরের জিনিষ না হইলে আর যেন আমাদের মন উঠে না। এখন অন্যের ধনে ছাড়া আমাদের রুচি নাই। এই পরকীয়া প্রেমের মোহ আমাদিগকে কাটাইয়া উঠিতে হইবে। দেশ বিদেশে যে সব সত্যের, যে সব আন্দোলনের লীলা-খেলা চলিতেছে, তাহা হইতে শিক্ষনীয় আমাদের অনেক কিছুই আছে, স্বীকার করি; কিন্তু সে সমস্ত হুবহু আমাদের দেশে আনিয়া ফেলিবার কোন প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন ত নাই'ই, তাহা হইতেছে ভয়াবহ। আমাদের দেশের সমস্যা বিশিষ্ট ধরণের; সে সমস্যার মীমাংসাও হইবে বিশিষ্ট ধরণে; অথবা আমাদের দেশের সমস্যার বৈশিষ্ট্য যেখানে, সেই দিক দিয়াই মীমাংসা সুরু করিতে হইবে। ইহাই হইল আমার মূলভাবের দ্বিতীয় কথা—ভারতের স্বধর্ম্ম খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, নিজস্ব সত্যের পথে চলিয়াই ভারতের যথার্থ সিদ্ধি ও সার্থকতা মিলিবে।

বোলশেভিকি জগতে যে বিপ্লব আনিয়াছে তাহার মূল প্রেরণা, তাহার মূল প্রেরনার শ্রেষ্ঠ দিকটি এই, মানুষকে মানব-সমাজকে সজ্ঞানে, সচেতন চেষ্টার দ্বারা একটা বিশেষ আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে। পূর্ব্বে ছিল **Laissez-faire** অর্থাৎ "যা হচ্ছে হ'তে দাও"র যুগ। মানুষ তাহার সমষ্টিগত উন্নতির বা বিবর্ত্তনের পথে

চলিতেছিল প্রাকৃতশক্তির স্বাভাবিক, সুতরাং মন্থর এবং অচেতন বা অর্দ্ধচেতন গতিধারায় আপনাকে গা-ভাসাইয়া দিয়া। জড়-বিজ্ঞানের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত বোলশেভিকি আসিয়া বলিল, "না, ও ভাবে নহে, মানুষ তাহার সমাজকে নিজের চেষ্টার বলে, জ্ঞান বুদ্ধি খাটাইয়া তবে একটা উন্নতস্তরে তুলিয়া ধরিতে পারিবে।" প্রকৃতিকে পুরুষকারের দ্বারা করায়ত্ত করিয়াই যুগ-যুগ-ব্যাপী বিবর্ত্তনকে একটা দ্রুত রূপান্তরে পরিণত করা সম্ভব। এই হিসাবে বোলশেভিকি মানুষকে একধাপ আগে লইয়া আসিয়াছে, অন্তত বোলশেভিকির মত এমন কায়মনোবাক্যে এই কার্য্যে আর কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই। কিন্তু বোলশেভিকি যে আদর্শে মানুষকে গড়িতে চাহিয়াছে তাহা স্থূল মনের বুদ্ধির নির্ম্মিত একটা আদর্শ; যে জ্ঞানে যে বলে সে চলিতে চাহিয়াছে তাহাও ঐ মানসিক স্তর অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই।

জগতের মানবসমাজের সমস্যা উঠিয়াছে আরও গভীরতর স্তর হইতে; সে সকল সমস্যার সম্যক মীমাংসা হইতে পারে এক উচ্চতর বৃহত্তর সত্যের ও শক্তির কল্যাণে। এই অতি-মানস বা অধ্যাত্ম সত্য ও শক্তির বিগ্রহ হইতেছে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের পুনর্জন্ম সম্ভব ও সার্থক এই অতিমানস বা অধ্যাত্ম সত্যের ও শক্তির জন্ম দিয়া।

যদি কোথাও থাকে তবে, ভারতের এই অতিমানস অধ্যাত্ম সত্যের ও শক্তির মধ্যেই রহিয়াছে জগতের, সমস্ত মানব সমাজের উদ্ধার। জীবনে, জড়-আয়তনে পর্য্যন্ত প্রকৃত রূপান্তর যদি সম্ভব হয় তবে তাহা হইতে পারে ঐ অতিমানসেরেই ঐ অধ্যাত্মেরই এক বিশেষ সত্যে ও শক্তিতে— কারণ, উহাই জীবন-প্রেরণার স্বভাব ও স্বরূপ।

এখানে "বোলশেভিকি" শব্দটির ব্যুৎপত্তি একটু দেওয়া প্রয়োজন। "বোলশেভিকি" হইতেছে "বোলশেভিক" এর বহুবচন। "বোলশেভিক"

অর্থ -বেশির দলের লোক। আমি "বোলশেভিকি" শব্দটি কথন বহুবচন হিসাবে লইয়াছি, কথন বা সমূহবাচক হিসাবে লইয়াছি—ইহার সম্পর্কে তাই কথন "তাহার", কথন বা "তাহাদের" প্রয়োগ করিয়াছি। তা ছাড়া, বাংলার বহুবচনটি বুঝাইবার জন্য সময়ে সময়ে "বোলশেভিকিরা", এই ডবল বহুবচনও ব্যবহার করিরাছি।

প্রবন্ধগুলি সবই সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে "বিচিত্রা", "উত্তরা" এবং "আত্মশক্তি" উল্লেখযোগ্য।

পণ্ডিচেরী
১৩৩৬, ১লা চৈত্র।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত



আমরা ও বোলশেভিকি

১

এক সময়ে গীতাই ছিল আমাদের দেশ-সেবকদের, বিপ্লবীদের শাস্ত্র। এই গ্রন্থখানিকে ব্রিটিশ সরকারও ক্রমে ভয়ানক চক্ষে দেখিতে সুরু করিয়াছিলেন। এই গীতার ধূন অনুসরণ করিয়া—তাহাকে যৌবনের হাওয়া যেখানে যেখানে সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে বিশেষভাবে তৎ তৎ স্থান অন্বেষণ করিয়াই—তাঁহারা বিপ্লবরূপ বহ্নির সন্ধানে ফিরিতেন। অপরিণত বয়সে গীতাপাঠ আর রাজদ্রোহ তখন প্রায় একই কথা হইয়াছিল। কিন্তু সে দিনকাল চলিয়া গিয়াছে। এখন গীতার সে তেজ বা মর্য্যাদা আর নাই। বর্ত্তমানে ব্রিটিশ সরকার সকল ভারতবাসীকে গীতার পঠন-পাঠনে খুব উৎসাহই দিবেন বলিয়া মনে হয়। গীতা হইতে যে ভয় ছিল তাহা দূর হইয়া গিয়াছে। কারণ গীতা অর্থ ধর্ম্ম-সাধনা, আধ্যাত্মিকতা; আর আধুনিক দেশ-সেবক যুবকগুলীর মতে ঠিক এই জিনিষটি হইয়া উঠিতেছে প্রকৃত দেশ-সেবার, সকল উন্নতির 'আধুনিকত্বে'র পরিপন্থী।

আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, * দেশোদ্ধারের স্বপ্ন যখন আমরা দেখিতে

* প্রথম স্বদেশীর যুগে ১৯০৫ সালে। তখনও অবশ্য হেমচন্দ্র দাসের মত দেশ সেবক ছিলেন—কিন্তু তিনি নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র, "কোটিকে গুটিক"।

আরম্ভ করি তখন যে সকল দেশভক্ত বিক্রমী কর্ম্মী মহাপুরুষদের নাম আমাদের হৃদয়ে স্পন্দন তুলিয়া দিত, যাঁহাদের আশীর্ব্বাদ কর্ম্মজীবনে আমরা যাচ্ঞা করিতাম, তাঁহারা হইতেছেন আমাদেরই দেশের গুরু গোবিন্দ সিংহ, রামদাস-শিবাজী, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, চিতোরেশ্বরীর দাস রাণা প্রতাপ, যশোরেশ্বরীর সেবক প্রতাপাদিত্য ; আর ইউরোপের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করিয়াছি, তখনও খুঁজিয়া লইয়াছি জান দার্ক, শুনিয়াছি ম্যাটসীনির বার্ত্তা। আজ কিন্তু সম্পূর্ণ আর-এক ধরণের দেবতা আসিয়া আধুনিক দেশ-সেবকের অর্ঘ্য আদায় করিতেছে। ঐ সকল প্রাচীন পুরাতন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগের নাম আধুনিকের কাছে নির্বীর্য্য নিরর্থক হইয়া পড়িয়াছে। আজ তরুণের আদর্শ মার্কস, বাকুনিন, লেনিন, মুস্তাফা-কামাল—আর খুব ঘরের কাছে হইলে বোধ হয় আমীর আমানুল্লা।

আধুনিকেরা আর স্বপ্ন দেখে না, তাহারা দেখিতেছে খোলা চোখে রূঢ় বাস্তবের চেহারা—কোন রকমেরই কল্পনার হাওয়া পৃথিবীর উপরে দৃঢ়বদ্ধ তাহাদের পা দুখানি টলাইতে পারে না, আকাশ-পথে উড়িয়া চলিবার পাখাও তাহারা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। "দেশের স্বাধীনতা" আজ তাহাদের কাছে একটা একান্ত বাহ্য অর্থ, অত্যন্ত স্থূল রূপ লইয়া ধরা দিয়াছে! আর এই বিশেষ অর্থটি, বিশেষ রূপটি এত বৃহৎ এত সর্ব্বগ্রাসী করিয়া সে দেখিতেছে, তাহাতে এতখানি আপন-হারা হইয়া গিয়াছে যে অন্য অর্থের অন্য রূপের কোন স্বাধীনতা মানুষের কাম্য হইতে পারে, এই কথা তাহার মনেও আসে কি না সন্দেহ। প্রথমত, স্বাধীনতা অর্থে প্রধানত সে বুঝিয়াছে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্থাৎ পরের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ। দেশের ধর্ম্ম সাধনায়, শিক্ষা-দীক্ষার যে স্বাধীনতা, অন্তরের চেতনায় আত্মায় যে স্বাতন্ত্র্য যে সমৃদ্ধি প্রয়োজন, তাহা তরুণের

কাছে তেমন সঙ্কুল সমস্যা নয়। তরুণের কথা, ভারত আগে রাষ্ট্র হিসাবে স্বাধীন—অনধীন হোক, পরে অন্য সব সমস্যা লইয়া ভাবিবার যথেষ্ট অবকাশ মিলিবে। দ্বিতীয়ত, এই রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতাও সে দেখিতেছে আরও বিশেষ একটা প্রয়োজনের দিক দিয়া, একটা সঙ্কীর্ণতর দৃষ্টি দিয়া, গ্রাসাচ্ছাদনের দাবির দিক দিয়া, অর্থনীতির হিসাবে। এই অর্থনীতিক স্বাধীনতাও সে আবার চাহিতেছে বিশেষ একটা শ্রেণীর জন্য—"প্রোলেটারিয়াটে"র জন্য।

আজ দেশ সেবাতির সম্মুখে যে সমস্যাটি প্রকাণ্ড অতিকায় হইয়া দেখা দিয়াছে তাহা হইতেছে অন্ন-সমস্যা। দেশের স্বাধীনতা চাই, আত্মকর্ত্তৃত্ব চাই কারণ, তাহা না হইলে, দেশের লোকের খাওয়া পরার কোন সুব্যবস্থা হইতে পারে না। ইংরাজকে তাড়াইতে হইবে, দেশের লোকের দেশ শাসন করিবে—দেশের যে নিরানব্বই ভাগ লোক দীন দরিদ্র, চাষামজুর তাহাদের জন্য; অর্থাৎ, ইহারা যাহাতে কাজ পায়, যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারে, পেট ভরিয়া খাইতে পারে; ইহাদের ছাড়া যে মুষ্টিমেয় কয়জন ভদ্রলোক সাজিয়া এখন সকল সুখভোগ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে তাহারা হইতেছে "প্যারাসাইট" (Parasites) পরগাছা, রক্তচোষার দল—দেশের তাহারা শত্রু, তাহাদের সমূলে নির্ম্মূল করিতে হইবে। স্বাধীনতা অর্থ দেশের "আসল" অধিবাসীদের মধ্যে গ্রাসাচ্ছাদনের সুবণ্টন।

আমরা যখন ছিলাম নবীন তরুণ, তখনকার ভাব ধারা কিন্তু ছিল অন্য রকমের। দেশের স্বাধীনতা চাহিতাম—কিন্তু তাহার ফলে দেশের লোক যে ভাল খাইতেও পরিতে পাইবে, এই কথাটা আমাদের মনে সর্ব্ব প্রথমে উঠিত না, আমাদের চেতনার খুব বেশি জায়গা অধিকার করিয়া ছিল না, এই তত্ত্বটা আমাদের কর্ম্ম-চেষ্টার মূল প্রেরণা ছিল না। দেশের

অর্থনীতিক বা রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতা বস্তুটিও আমাদের কাছে ছিল একটা প্রতীক মাত্র—একটা বৃহত্তর গভীরতর সিদ্ধির আশ্রয় বা অবলম্বন ; অর্থাৎ বাহিরের এই সকল মুক্তির মধ্যে দেশের অন্তরাত্মারই মুক্তি প্রতিষ্ঠিত বিকশিত হইয়া উঠিবে। দেশ স্বাধীন হইলে সাংসারিক উন্নতি আমাদের হইবে, ভাল খাইতে পরিতে পারিব - হয়ত ; কিন্তু আসল কথা তাহা নয়, আসল কথা এই, স্বাধীনতা দেশের অন্তরের সৌন্দর্য্যকে সত্যকে অধ্যাত্ম-পুরুষকে জাগ্রত করিয়া ধরিবে। গ্রাসাচ্ছাদনের বিষয়টি একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছিলাম বলিলে অন্যায় হইবে, তবে কেবল এই গ্রাসাচ্ছাদনেরই তত্ত্বের উপর ইহারই ছক বা সূত্র অনুসারে স্বাধীনতার সৌধ যে গড়িয়া তুলিতে হইবে, এমন বিশ্বাস বা প্রয়াস তখন ছিল না।

অবশ্য বলা যাইতে পারে সে-যুগে দেশভক্তেরা কেবল স্বপ্নই দেখিয়াছে - কিন্তু এ যুগে চলিয়াছে স্বপ্নকে বাস্তব করিয়া ধরিবার সাধনা। অন্তরাত্মার, অধ্যাত্ম পুরুষের স্বাধীনতা যে পদার্থটি হৌক না তাহাকে যদি ব্যবহারের জীবনে মূর্ত্ত, বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিতে হয় তবে রাজনীতির এবং অর্থনীতির একটা বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে আসিয়া তাহাকে ধরা দিতেই হইবে। এ কালের সাধকেরা তাই মাটসীনির অনুসরণ করিতেছে না ; কারণ, মাটসীনির কাজ এখন নাই, হয়ত তাহা হইয়া গিয়াছে অথবা ভবিষ্যতে হইতে পারে। বর্ত্তমানে প্রয়োজন কাভুরের। নীরস বাস্তবের রূঢ় কর্ম্মী চাই, স্বপ্ন দেখার সময় আর নাই - তাই ত লেনিন, তাই ত মুস্তাফা কামাল আজকালের যুবকদের বরণীয় আদর্শ।

কিন্তু কথাটি এই—বাস্তব সৃষ্টির আকার প্রকার, তাহার সামর্থ্য তাহার মর্য্যাদা নির্ভর করে বাস্তবের পিছনে আছে যে ভাব, যে স্বপ্ন তাহারই উপর। যে তত্ত্ব বা সত্য অন্তরে সিদ্ধ, তাহাই বাহিরে বিধি-বিধানের, ব্যবস্থার রূপ লইয়া প্রকট ও প্রতিষ্ঠ হইতেছে ও হইবে। ভিতরের বীজ

যে ধরণের বাহিরের রূপও তদনুরূপই হইবে, অন্যথা নয়। ভিতর ছাড়া একটা বাহির কখন গড়িয়া উঠিতে পারে না, ভাব ছাড়া কেবল একটা রূপ জন্ম লইতে পারে না। আধুনিকের যে বস্তুতন্ত্র প্রয়াস, তাহারও পিছনে আছে একটা বিশেষ তত্ত্ব বিশেষ দর্শন—একটা স্বপ্নই; তবে তাহা অন্য প্রকারে এই যা পার্থক্য।

আমরা তরুণকালে যে তত্ত্বের যে স্বপ্নের উপর স্বাধীন ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলাম। তাহা হইতেছে ভারতের অন্তর-পুরুষ ভারতের সনাতনী অধিষ্ঠাত্রী দেবী—"ভারত-শক্তি"। আমরা যখন বন্দেমাতরং উচ্চারণ করিয়াছি তখন এক সত্যকার মাতৃশক্তিতে বিশ্বাস করিয়াছি, তাঁহার জীবন্ত স্পর্শ অনুভব করিয়াছি। দেশ আমাদের চেতনার ছিল বাস্তবিকই এক জাগ্রত দেবী। দেশ বলিতে শুধু খানিকটা মাটি, গাছপালা, পাহাড় নদীর সমষ্টি বুঝি নাই; এমন কি কেবল দেশের অধিবাসীর সমবায়, ইহাও বুঝি নাই। এই সকলের পিছনে, এই সকলের উপরে আছেন এক সচেতন পুরুষ; ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়া, স্থূল আধাররূপে ধরিয়া প্রকটিত লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে জগজ্জননীর যে বিশেষ এক সম্ভূতি—দেশ বলিতে আমরা তাঁহাকেই বুঝিয়াছি, পূজা করিয়াছি। ঋষি বঙ্কিমের সমগ্র মন্ত্রখানি আমাদের কাছে অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। আজ কিন্তু এই ধরণের কথা শুধু কথাই—কাব্য, কল্পনা, উপমা, অলঙ্কার, অতিশয়োক্তি—'মিছে কথা' ছলনা। দেশ বলিতে আজ জড় ভূখণ্ডই বুঝিতেছি, আর দেশের জীবন, ঐ যতগুলি লোক সেই মাটি আপনার বলিয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া বাঁচিয়া থাকিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু আধুনিকের ইহাও এক দর্শন, এক তত্ত্ব—এক স্বপ্নই। এই

দর্শনের প্রথম সূত্র—জীবনের লক্ষ্য সুখ, মঙ্গল নয়; জগতে সার্থকতা, ব্যষ্টিগত হোক আর সমষ্টিগত হোক কষিয়া দেখিতে হইবে শ্রেয়ের নয়, প্রেয়ের কষ্টিপাথরে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কিসে হয় তাহাই পুরুষার্থ-তাহারই ব্যবস্থা হইতেছে আশু প্রধান ও একমাত্র প্রয়োজন। অন্তরাত্মার ঊর্দ্ধগতি বলিয়া কোন জিনিষ ব্যক্তির পক্ষেই স্বীকার করিতে চাহি না, একটা দেশের পক্ষে ও-বস্তুর অস্তিত্বই হইয়া উঠিয়াছে পরম হাস্যকর ব্যাপার। অন্তর জগৎ বলিতে মন ছাড়া আর কিছু বুঝি না; সুতরাং অন্তর-জগতের চর্চ্চা আমাদের কাছে পর্য্যবসিত হইয়াছে লেখা ও পড়ায়—দেশ হইতে অজ্ঞান দূর করা, দেশকে শিক্ষিত (দীক্ষিত নয়) করিয়া তোলা অর্থ বর্ণ-পরিচয়ের প্রচার ও প্রসার।

আজ যে আমরা স্বপ্ন দেখিতেছি না, তাহা নয়—তবে সে স্বপ্ন হইয়া পড়িয়াছে একান্ত আধিভৌতিক। কারণ, আমাদের চেতনা মাটি ছাড়িয়া বেশি দূরে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। মানুষের চেতনা, মানুষের স্বপ্ন এবং মানুষের সিদ্ধি যে আধিদৈবিক হইতে পারে, তাহা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি; আর সে সব যে কখন আধ্যাত্মিক হইতে পারে,—এমন সম্ভাবনা কেহ কেহ আশ্চর্য্য হইয়া শুনিয়া যায়, কেহ কেহ আবার শুনিয়াও কিছুই জানে না, বুঝে না—

আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃনোতি।
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥

একদিন ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার প্রথম আমলে পাশ্চাত্যের ঐশ্বর্য্যে আমরা এতখানি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম যে হাবে ভাবে, অন্তরে বাহিরে, ব্যষ্টিগত জীবনে সর্ব্বত্র সর্ব্বথা ইংরাজ হইয়া উঠাই তখন আমাদের ছিল পরম কাম্য। সে যুগ চিরকালের জন্য চলিয়া গিয়াছে এই কথাই মনে হইয়াছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি পাশ্চাত্যের যে নূতন একটি বন্যা সম্প্রতি দেশের উপর আসিয়া পড়িতেছে, তাহার তুলনায় আগেকার আক্রমণটি তেমন ভয়াবহ বলিয়া আর মনে হয় না। কারণ, প্রথম যুগের অনুচিকীর্ষাটি ছিল অনেকটা খোসখেয়ালের অর্থাৎ রোমান্টিক ব্যাপার; কিন্তু আধুনিকের যে বিপুল প্রখর প্রবাহ ইউরোপ হইতে আসিতেছে তাহাতে দেশের যুবকমণ্ডলী আপনাদিগকে ধরিয়া দিতেছে যেন ধীরে সুস্থে, চারিদিকে দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া। এবারকার চেষ্টা সজ্ঞানে, রীতিমত আটঘাট বাঁধিয়া চলিয়াছে ভারতের ভারতত্ব নষ্ট করিয়া দিবার জন্য। ভারতের ভারতত্বে তরুণদের আর বিশ্বাস নাই—আজ তাহাদের মতানুসারে, এই ভারতত্ববাদই ভারতের সত্যকার উন্নতির একমাত্র পরিপন্থী, এই মোহ মন্ত্রের বশেই ভারত এ যাবৎ পড়িয়াছিল প্রাচীনের পুরাতনের সুতরাং পতনের যুগে।

আজ আমরা শুনিতেছি, তুর্কী বলিতেছে সর্ব্বতোভাবে ইউরোপীয় হইয়া উঠিতে হইবে—নচেৎ আধুনিক কালে উদ্ধার নাই, ইহাই হইল যুগধর্ম্ম। ইউরোপের বন্দুক-কামানই যে কেবল গ্রহণ করিব তাহা নয়, গ্রহণ করিব ইউরোপের হ্যাট-কোট-পাৎলুন; ইউরোপের

ইউরোপের কর্ম্মশক্তি কেবল আয়ত্ত করিব না, পরন্তু আত্মসাৎ করিব তাহার মুখের ভাষা (অন্ততঃ ভাষার বর্ণমালা), তাহার সামাজিক রীতি-নীতি চালচলন। আফগানও আজ কেবল তাহার বিমানপোত শুধুই ইউরোপ হইতে আনাইতেছে না, তাহার ছেলে মেয়েদিগকে দলে দলে ইউরোপে পাঠাইতেছে শিক্ষাদীক্ষার জন্য, সেখান হইতে শিক্ষকও আনাই-তেছে যেমন প্রয়োজন—রাণী সুরিয়া আফগানী আলখেল্লা ছাড়িয়া ইউ-রোপীয় গাউন ধরিয়াছেন, টেনিস-র‍্যাকেট হাতে লইয়াছেন।

জগতে আজ যাহারাই স্বাধীন যাহারাই প্রধান হইয়া উঠিতেছে আগে তাহাদের ইউরোপীয় বনিয়া যাইতে হইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া তাই আমাদের আশঙ্কা হইয়াছে—"ভারত বুঝি ঘুমায়ে রয়"। স্বদেশীর নামে আমরা কি প্রাচীনের পচাগলা ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে যাইয়া পড়িতেছি না? সময় থাকিতে এখন তবে ফিরিয়া আসা কর্ত্তব্য। ইউরোপ জীবন্ত, জীবন্তকে অনুসরণ করিব, আত্মসাৎ করিব—প্রাণ হইতেই প্রাণের সৃষ্টি। ইউরোপ আজ জগতেব শীর্ষদেশে; জগতের শীর্ষদেশে উঠিতে হইলে ইউরোপীয় হইতে হইবে। শুধু তাই নয়, ইউরোপের কবল হইতে যদি আমরা উদ্ধার পাইতে চাই, ইউরোপের সহিত দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিতে চাই, চাই ইউরোপের ভয়ভক্তি অর্জ্জন করিতে, তবে ইউরোপ অপেক্ষাও ভাল করিয়া ইউরোপেরই অস্ত্র শস্ত্রে—ভিতরে এবং বাহিরে, কর্ম্মে এবং ধর্ম্মে উভয়তঃ—সজ্জিত হইতে হইবে, অর্থাৎ একান্ত ভাবে হইয়া উঠিতে হইবে "আধুনিক"।

এই যে আধুনিকের আহ্বান ভারতের যুবকমণ্ডলীর কাণের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে মরমে প্রবেশ করিতেছে এবং প্রাণ আকুল করিয়া তুলি-তেছে, তাহার লক্ষণ চারিদিকে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এই আধুনিকের বার্ত্তা ভারতের ভাগ্যে যে কি সমস্যা—কি বিপদ ডাকিয়া আনিতেছে

তাহা বিশেষভাবে দেখিয়া শুনিয়া লইবার দিন আসিয়াছে। অথচ এই দিকে যথেষ্ট দূরে থাকুক সামান্য দৃষ্টিও যে দেওয়া হইতেছে তাহা মনে হয় না।

কিন্তু গোড়াতেই জিজ্ঞাসা করিব, আধুনিক হইতে হইলে বা ইউরোপের সহিত সমানে টক্কর দিয়া চলিতে হইলে যে ইউরোপীয় বনিয়া যাইতে হইবে এমন কি প্রয়োজন আছে? জাপান যেদিন আধুনিক জগতে ধূমকেতুর মত হঠাৎ আসিয়া আবির্ভূত হইল, সেদিন ত তাহাকে ইউরোপীয় বলিয়া ভুল হয় নাই, নিজেও সে এই ভুল করিতে দেয় নাই। ইউরোপের যন্ত্র-শক্তি সে অধিকার করিয়াছিল কিন্তু নিজের অন্তরাত্মার বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন দিয়া নয়।

তুর্কী বা আফগান ইউরোপীয় হইয়া যাইতে পারে; কারণ তাহাদের নিজস্ব জাতীয় জীবনের মূল সুদূর অতীতের মধ্যে প্রসারিত নয়। ভারতের তুলনায় তাহারা নূতন সবুজ কাঁচা জাতি, সুতরাং এক ক্ষেত্র এক জলবায়ু হইতে তুলিয়া অন্যক্ষেত্রে অন্য জলবায়ুতে সহজে তাহাদিগকে রোপণ করা যায় এবং ইহাতে তাহাদের প্রাণহানি হইবার সম্ভাবনা অনেক কম। কিন্তু ভারতের প্রাচীন সুবিশাল মহীরুহ তাহার শিকড় কোথায় কতদূর পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে কে নির্ণয় করিবে? ইহাকে ধরিয়া নাড়া-চাড়া তত সহজ ও সম্ভব নয়, ইহাকে স্থানান্তরিত করিবার প্রয়াস অর্থ মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা। তারপর ভারতের যে এই রকম একটা অতি দীর্ঘ, অনাদি অতীত আছে, তাহাই নয়; এই অতীত আবার একটা বিশেষ ধরণের শিক্ষায় দীক্ষায় সাধনায় সিদ্ধিতে মহান। অতীতের এই সম্পদ, এত লোকের এত যুগের প্রয়াসের ফল, ভারতের পক্ষে তাহা একটা মহা-বল—ইহাকে হারান যাইতে পারে বটে, কিন্তু একবার হারাইলে ফিরিয়া পাওয়া সুকঠিন। তুর্কীর বা আফগানের শিক্ষায় দীক্ষায় এমন কিছু নাই

যাহা নষ্ট হইলে মানবজাতির বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে; * কিন্তু ভারতের সংস্কৃতি কেবল ভারতের নয়, মানব সমাজেরই এক বিপুল ঐশ্বর্য্য। তারপর তৃতীয় কথা এই, ভারতের অতীত কেবলই অতীত নয়—তাহা বর্ত্তমানে জীবন্ত, তাহার রেশ ভবিষ্যতের মধ্যে প্রসারিত। মিশরের অতীত আছে কিন্তু প্রাচীনের মিশর আর বর্ত্তমানের মিশর এক জিনিষ নয়, উভয়ের মধ্যে কোন সংযোগ নাই, মানুষ হিসাবে, শিক্ষা-দীক্ষা হিসাবে, সকল হিসাবেই। জগলুলের মিশর আর রামসেস'এর মিশর সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। সেই রকম আধুনিক আফগানিস্থানের সহিত প্রাচীন গান্ধার, অথবা রেজাখাঁর পারস্যের সহিত জরথুস্ত্রীর ইরান সমান সূত্রে গাঁথা নয়—মাঝখানে একটা, একটা কেন বোধ হয় একাধিক, ছেদ পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতে দেখি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—বৈদিক যুগ হইতে আধুনিক যুগ অবধি ভিতরের চেতনায় চলিয়া আসিয়াছে একই স্রোত একটানা প্রাণের ধারা বরাবর সমানভাবে জাগ্রত জীবন্ত; সুদূরতম অতীতের ভিতর দিয়া আধুনিকতম বর্ত্তমান পর্য্যন্ত একই নাড়ী স্পন্দিত হইয়া চলিয়াছে। রাম বা কৃষ্ণ হইতে রামকৃষ্ণ অবধি ভারতের অন্তর পুরুষের, ভিতরের ভাবের ও চেতনার, নামরূপ পর্য্যন্ত এক—একই সজীব প্রেরণা উদবর্ত্তিয়া চলিয়া আসিয়াছে। এই দিক দিয়া ভারতের সহিত কিছু তুলনা হইতে পারে চীনের ও জাপানের। তবে নিজের অতীতের সহিত চীনের সংযোগ এখনও আছে বটে; কিন্তু সে অতীতকে চীন জীবন্ত রাখিতে পারে নাই, তাহা চীনের প্রাণের উপর ক্রমে একটা

---

* ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা ধরিলে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় বই কি? তুর্কী যদি ইউরোপীয় একটা জাতির নকল সংস্করণ না হইয়া, নিজস্ব কিছু সৃষ্টি করিতে পারে, আফগানও যদি আবিষ্কার করে গোষ্ঠী জীবনের নূতন একটা রূপায়ন, তবে তাহাতে সমস্ত মানব সমাজই সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিবে।

ভারই হইয়া উঠিতেছে। এক জাপানই বোধ হয় তাহার আদি উৎপত্তি হইতে এখন পর্য্যন্ত একটা জাগ্রত জীবন-ধারা পোষণ করিয়া আসিতে পারিয়াছে। কিন্তু প্রথম কথা ভারতের তুলনায় জাপান খুব বেশী পুরাতন নয়; দ্বিতীয় কথা, ভারতের প্রাণধারার উদবর্ত্তনের ইতিহাস জাপানের অপেক্ষা একটা গভীরতর রহস্যে পরিপূর্ণ।

অবশ্য শকলৎওয়ালা বা জহরলাল বলিবেন ঠিক এই কথাটি যে প্রাচীন ভারতে আর আধুনিক ভারতে জীবন্ত যোগসূত্র কিছু নাই। প্রাচীন ভারত প্রাচীন গ্রীস রোম বা মিশরের মতই মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে। যদি কিছু জীবন্ত থাকে তবে সেই ভূতটা এবং ভারতের সকল অধঃপতনের মূল হইতেছে আপনাকে ঐ "ভূত গ্রস্ত" করিয়া রাখায়। অতীতের সতী-দেহকে কাঁধে করিয়া আমরা দেওয়ানা হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছি, তাই আমাদের দুর্দ্দশা; আমাদের কর্ত্তব্য ঐ মৃতপিণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দিতে, তাহার ভার হইতে নিঃশেষ মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন জীবনে উঠিয়া দাঁড়াইতে।

এই যাঁহারা চাহিতেছেন "তাজা ভারতের নয়া দর্শন" তাঁহাদিগকে কিরূপে বুঝাইব কোথায় ভারতের প্রাণশক্তির উৎস, কোথায় তাহার সত্যকার দর্শন? এক বৈদিক ঋষির কথায় বলিতে পারি—পশ্যতি অক্ষণ্বন্, ন বিচেতদন্ধঃ—চক্ষু যাহার আছে সেই দেখিতে পারে, অন্ধের কোথায় জ্ঞান।

৩

আর তরুণ ভারতের মনে প্রাণে যে ইউরোপীয় রং ধরিতেছে, তাহা ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে তেমন বিশেষ কিছু আসে নাই, যেমন আসিয়াছে এক রুশ হইতে। আমাদের ছাত্রবৃন্দের যুবকমণ্ডলীর উপর এই রুশীয় প্রভাবের ইতিহাস খুবই শিক্ষাপ্রদ এবং বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিবার জিনিষ। সে চেষ্টা পরে কথঞ্চিৎ আমরা করিব। আপাততঃ এই রুশীয় বার্ত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু আমরা বলিতে চাই।

বোলশেভিকে'রা তাহাদের রাষ্ট্রে তাহাদের সমাজে যে বিশেষ বিশেষ বিধিব্যবস্থা নূতন প্রণয়ন করিতেছে সে সকলের দোষগুণ আমরা বিচার করিব না—আমরা এমনও যদি স্বীকার করিয়া লই যে ইহাদের অনেকখানিই হয়ত সামান্য অদল বদলের ফলে, আদর্শ সমাজের রাষ্ট্রের আদর্শ বিধিব্যবস্থা হইয়া উঠিতে পারে, তবুও তাহাতে আমাদের বক্তব্যের কিছু আসে যায় না। বোলশেভিকের "তন্ত্র" সম্বন্ধে আমাদের উচ্চবাচ্য নয়, আমাদের বিচার্য্য বোলশেভিকির "তত্ত্ব" অর্থাৎ বোলশেভিকি বিধিব্যবস্থা অনুষ্ঠানাদির পিছনে রহিয়াছে যে মনোভাব, চিত্তের যে মূল দৃষ্টিভঙ্গি—কারণ এই জিনিষটিরই উপর নির্ভর করিতেছে ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা ও সিদ্ধি, অব্যবহিত বর্ত্তমানের উপর ইহার প্রভাব যতই অস্পষ্ট ও নগণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হোক না কেন।

বোলশেভিকির বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম ও প্রধান অভিযোগ এই যে, উহা নাস্তিক্য বুদ্ধি বা গীতার কথায়, "তামস-জ্ঞান"* প্রসূত এবং উহার

---

* ১৮।২২

প্রাণ সহযোগের সমবায়ের মধ্যে নয় কিন্তু দ্বন্দ্বের রেষারেষির মধ্যে। বোলশেভিকি জগৎকে দেখিতেছে কেবল জড়-শক্তির সমষ্টিরূপে, সমাজের গঠন ও বিবর্ত্তনের মূল দেখিতেছে শুধু অশন-বসনের প্রয়োজন, মানুষের, মধ্যে দেখিতেছে মর্ত্ত্য প্রাণী—পশুরই ভদ্র সংস্করণ মাত্র। মানুষকে মানুষের প্রতিষ্ঠানকে লইয়া সে যাহা ও যত কিছুই করিতে চেষ্টা করুক না কেন, তৎসমস্ত আবদ্ধ ঐ সীমাটুকুর মধ্যে। মানুষ যে দেবতা, মানুষ যে ব্রহ্ম, মানুষ যে ভগবান স্বয়ং—এই সকল কথা তাহার কাছে যে কেবল অবান্তর এমন নয়, ইহাদিগকে সে মনে করে মানুষ মারা বিষমন্ত্র। মানুষের ব্যষ্টিগত জীবন কেবল নয়, তাহার গোষ্ঠীগত জীবনের ধারাও কেবল দেহের প্রাণের এমন কি মনের বুভুক্ষা দিয়াই নিয়ন্ত্রিত হয় না, সামাজিক বিবর্ত্তনের অন্তরেও অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রভাব একান্ত শূন্য নয়—বোলশেভিকির শাস্ত্রে এই জাতীয় তত্ত্ব হইতেছে পাষণ্ডী-মত।

বোলশেভিকির আদর্শ উচ্চতা হিসাবে যে খাট শুধু তাহা নয়, পরিসর হিসাবেও আবার সঙ্কীর্ণ। যতটুকু ক্ষেত্রের মধ্যে তাহার কর্ম্মশক্তিকে সে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছে, তাহাকেও যতখানি সম্ভব ছোট করিয়া তোলাই যেন হইয়াছে তাহার প্রধান চেষ্টা। বোলশেভিকির দেশ—তাহার সমাজ তাহার রাষ্ট্র, হইতেছে এক কৃষক ও মজুরের রাজ্য—সেখানে থাকিতে হইবে কৃষক হইয়া মজুর হইয়া আর না হয় তাহাদের সেবক হইয়া। কৃষকেরা মজুরেরা—হাতে হাতিয়ারে কাজ করে যাহারা তাহারা, দীন হীন অপাংক্তেয় হইয়া পড়িয়া থাকুক, এ কথা কেহই বলিবে না, তাহারাও মানুষই হইয়া উঠুক, বাহিরের সম্পদ কেবল নয় ভিতরের সম্পদও তাহারা আহরণ করুক, মানুষের অধিকার তাহারা অর্জ্জন করুক, মানুষের কর্ত্তব্যও তাহারা সম্পাদন করুক—ইহা সকলেরই কাম্য। কিন্তু

বোলশেভিকিরা তাহাতে সন্তুষ্ট নয়. বোলশেভিকির প্রচেষ্টার মূল সূত্র, প্রধান তত্ত্ব হইতেছে শূদ্রের অভ্যুত্থান ও একছত্র প্রভুত্ব এবং বিরোধের ভিতর দিয়া এই প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ সে চায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতি বা অভিজাত বর্ণত্রয়ের লোপ সাধন করিতে বা শূদ্রের পর্য্যায়ে টানিয়া আনিতে। শূদ্রই ব্রাহ্মণ, শূদ্রই ক্ষত্রিয়, শূদ্রই বৈশ্য হইবে—প্রয়োজনমত ; অন্য কোন বর্ণের পৃথক অস্তিত্ব অসার্থক। *

নূতন শূদ্রকে সৃষ্টি করিয়া বোলশেভিক তাহার নূতন সমাজের পত্তন করিতে চাহিতেছে। কিন্তু এই চেষ্টা হইতেছে যাহাকে বলে, পিরামিডকে তাহার চূড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার দুশ্চেষ্টা। ফলতঃ নূতন সমাজের সৃষ্টি সম্ভব একমাত্র নূতন ব্রাহ্মণের সৃষ্টি দিয়া—যাহারা সত্য সত্যই ব্রহ্মবিৎ কেবল ব্রহ্মবন্ধু নয়। ভারতের জ্ঞান এই সত্য বলিয়া দিয়াছে এবং ভারতের কর্ম্মও ইহাকেই প্রমাণিত করিয়া দিয়াছে। অবশ্য আধুনিক-

* এইখানে একটি কথা উঠিতে পারে বোলশেভিক-বর্ণকে বৈশ্য না বলিয়া, শূদ্র নাম দিতেছি কেন ; বৈশ্যেরই ধর্ম্ম কৃষি-বাণিজ্য, এই ত শাস্ত্রের বাক্য। বৃত্তি বা বাহ্য কর্ম্মের দিক দিয়া বোলশেভিকিরা বৈশ্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু অন্তরের ভাবে ও ধর্ম্মে তাহারা শূদ্রই। কারণ, বোলশেভিক-তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেক মানুষের মূল্য তাহার সামাজিক প্রয়োজনের উপর একান্ত নির্ভর করে আর সে প্রয়োজন হইতেছে বিশেষ ভাবে শারীরিক প্রয়োজন। মানুষের ওজন তাহার "পরিচর্য্যা"র ক্ষমতার মাপে অর্থাৎ শরীর খাটাইয়া গোষ্ঠী-পুরুষের কতখানি কাজ করিয়া দিতে পারে তাহার মাপে ; মানুষের মর্য্যাদার অন্য মাপ নাই, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও সার্থকতারও (personal worth) বিশেষ কোন অর্থ নাই। তা-ছাড়া, পৃথিবী হইতেছে, উপনিষদের মতে, শূদ্রবর্ণা—বোলশেভিকিরা যে ভাবে মাটিকে সর্ব্বস্ব করিয়া মাটির উপর বুক দিয়া চলিতে চাহিতেছে, তাহাতে মাটির সন্তান বলা ছাড়া আর কি সত্যকার গোত্র দেওয়া যাইতে পারে ?

বুদ্ধি লইয়া বলা যাইতে পারে এই যুগে বোলশেভিকারাই সেই নূতন ব্রাহ্মণ. এবং লেনিন তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ! তবে কথা এই, আধুনিকের ব্রহ্ম হইতেছে অন্ন-ব্রহ্ম এবং আধুনিক ব্রাহ্মণ হইতে গেলে চতুষ্পদ ব্রহ্মজ্ঞানের এমন কি "শমোদমস্তপঃ শৌচং"—প্রভৃতির বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। লেনিন শূদ্রের ব্রাহ্মণ হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু যে ব্রাহ্মণের কল্যাণে সমাজ পাইবে সর্ব্বাঙ্গিক সার্থকতা, একটা উচ্চতর কল্যাণ তাঁহারা অন্য ধরণের পুরুষ।

ফলতঃ বোলশেভিকিরা যে মারাত্মক ভুলটি আশ্রয় করিয়া চলিয়াছে তাহা ঠিক এইখানে, শুধু বাহিরের নিয়ম কানুন দিয়া কেবল শাসনের-জোরে তাহারা মানুষের, সমাজের, জগতের নূতন রূপ গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে। আগে যে অন্তরের, অন্তরাত্মার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, বোল-শেভিকিরা তাহা মানে না—কারণ, তাহাদের দৃষ্টিতে অন্তরাত্মা ত নাই-ই অন্তরও আছে কি না সন্দেহ। তাহারা জড় বিবর্ত্তনবাদী—তাহাদের বিশ্বাস মানুষ হইতেছে পারিপার্শ্বিকের ফল মাত্র। মানুষের পরিবেষ্টন, তাহার বাহিরের অবস্থা বদলাইয়া দাও, দেখিবে মানুষের স্বভাব ক্রমে বদলাইয়া যাইতেছে। বাহিরের অবস্থার পরিবর্ত্তন যে রকম করিয়াই হোক যদি একবার ঘটাইতে পার, জোর জবরদস্তি করিলেও কোন দোষ নাই, তবে অন্তরের পরিবর্ত্তনও যতদূর প্রয়োজন আপনা হইতে ক্রমে আসিবে।

বোলশেভিকির এই দর্শনে যে আংশিক সত্য আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবে। বাহিরের প্রভাব ভিতরের উপর আছে, মনের উপর দেহের প্রভাব স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু ইহা অপেক্ষা গভীরতর বৃহত্তর সত্য হইতেছে বাহিরের উপর ভিতরের প্রভাব দেহের উপর মনের প্রভাব। বোলশেভিকিরা প্রথম আবেগে যে আমূল পরিবর্ত্তন সমাজে আনিতে

চাহিয়াছিল, প্রথমে যে বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিল যে তাহাদের আদর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থাদি অখণ্ডভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে, কিছুদিন চেষ্টার পরে তাহারা কার্যতঃ স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে তাহা সম্ভব নয়, পুরাতনের সাথে কিছু মিটমাট কিছু রফা কোথাও দরকার। আর এই যে পুরাতনের সহিত মিটমাট বা রফা ইহার অর্থ নিজের স্বরূপকেই খর্ব্ব করা, নিজের স্বধর্ম্মকেই জলাঞ্জলি দেওয়া নয় কি ?

বোলশেভিকিরা সমাজের একটা ছক আঁকিয়া দিয়াছে ; কিন্তু সেই ছকের খাপে খাপে মিলাইয়া তাহার মধ্যে মানুষকে, মানুষের অনুষ্ঠানকে জীবন্ত পরিস্ফুট করিয়া ধরিতে হইলে ভিতরে যে ধরণের যে স্তরের পরিবর্ত্তন আগে প্রয়োজন তাহার সন্ধান বোলশেভিকি পায় নাই—সে কর্ম্মের কৌশল তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে নাই। রূপ দিয়া জীবনের নব গঠন হয় না, জীবন দিয়াও অর্থাৎ প্রাণাত্মক জীবন দিয়াও হয় কিনা সন্দেহ—জীবনের পিছনে যে প্রজ্ঞাত্মক জীবন তাহাই জীবনে জীবন্ত সত্যবান্ রূপ সৃষ্টি করিয়া চলে।

সমাজের ছোটখাট সংস্কার করিতে হয়, অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত না করিলেও চলিতে পারে, বাহ্যিক বিধিব্যবস্থার দ্বারাই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু সমাজে যখন চাহিতেছি একটা বিপ্লব ও বিপর্য্যয়, জীবনযাত্রার গোড়াকার সূত্র ধরিয়াই যখন টান দিয়া চলিয়াছি, তখন অন্তরের, অন্তরাত্মার হিসাব আগে না করিলে, বাস্তবের স্থূলরূপের আদি-উৎপত্তি যে সূক্ষ্ম চিন্ময় লোকে সেখানে বীজ বপন না করিয়া আসিতে পারিলে, সকল শ্রম পণ্ড হইতে বাধ্য। জগতে যে দুঃখ দেখিয়া বুদ্ধদেব পথের ভিখারী হইয়া গিয়াছিলেন—সেই দুঃখ দূর করিয়া, দুঃখের সমাজকে সুখের সমাজে পরিণত করা কেবল জড়বুদ্ধির কাজ নয়, প্রয়োজন অন্য রকমের সাধনা।

৪

বোলশেভিকি তাহাদের সমস্ত সমাজটি গড়িয়া তুলিতে চলিতেছে একটা দারুণ সংঘর্ষের উপরে - যেন এই সংঘর্ষই সমাজের জীবনীশক্তি। বোলশেভিকিরা একটা বিশেষ গোষ্ঠী; এবং এক একটি বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতিপত্তি একচ্ছত্র প্রভুত্ব যেখানে লক্ষ্য সেখানে সংঘর্ষই হইবে যে গোড়ার তত্ত্ব তাহা আশ্চর্য্যের নয়। জর্ম্মণ দর্শনের একটা সাধারণ কথা এই যে, পরের সহিত সংঘর্ষেই জন্মে ও বাড়িয়া উঠে নিজের সম্বন্ধে চেতনা; তাই ঠিক এই সূত্রটি দিয়া বোলশেভিকির আদিপিতা জর্ম্মণ মার্কস তাঁহার নব্য সমাজ-তন্ত্র আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রমিকের রাজত্ব চাই—চাই তবে অ-শ্রমিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা। এই যুদ্ধ যত তীব্র হইয়া উঠিবে শ্রমিকের আত্ম-বোধ, স্বাতন্ত্র্য তত স্পষ্ট, তত দৃঢ় হইয়া থাকিবে। প্রাচীন গ্রীসের মনীষী হেরাক্লিত মিথ্যা বলেন নাই, যুদ্ধই সকল জিনিষের জনক।

ভাল কথা। কিন্তু আর এক দিকের আর একটি সহজ সত্যকেও তাই বলিয়া অগ্রাহ্য করা চলে না। একটা দেশ হইতেছে নানা গোষ্ঠীর সমবায়। এক একটি গোষ্ঠী অর্থ এক এক ধরণের শক্তি-কেন্দ্র এবং গোটা সমাজের বিশেষ বিশেষ সার্থকতার ধারা। এই সকলেরই চাই সমন্বয় সমৃদ্ধি—তাহাতেই দেশের সমাজে অখণ্ড উন্নতি। হইতে পারে বোলশেভিকিরা যাহাদের লইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহারা সংখ্যার দিক দিয়া দেশের নব্বই কি নিরানব্বই ভাগ। কিন্তু এই হেতু দেখাইয়া কি দেশের এক ভাগ যাহারা তাহাদিগকে দলিয়া পিষিয়া ফেলিতেই হবে? আধুনিক ডেমোক্রাশী একটা জিনিষ বিশেষরূপে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে

ফলতঃ গণতন্ত্রের অন্তরাত্মাই ইহার মধ্যে তাহা হইতেছে, বহুমতের পূজা; বোলশেভিকেরা এই পূজার সীমা বাড়াইতে বাড়াইতে মন্ত্রটির অর্থ কার্য্যতঃ করিয়া তুলিয়াছে অল্পমতের উপর অত্যাচার।

বহুর কাছে অল্পকে আত্মবলি দিতে হইবে, বৃহতের স্বার্থে ক্ষুদ্রের স্বার্থকে ঠেলিয়া চলিবে, এই রকম একটা কথা জনগণমনের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া আশ্রয় পাইয়াছে। বস্তুর মর্য্যাদা নিরূপণ হয়, যেন তাহার কলেবর দিয়া—বৃহৎ হইলেই তাহা মহৎ। জড় দৃষ্টির প্রভাব আমাদের উপর এতই হইয়া উঠিতেছে যে জিনিষের মূল্য স্থির করিতে গিয়া আগে দেখি তাহার ওজন, তাহার গুণ নয়। তাইত আধুনিক কালে চৌদ্দ পোয়া শরীরকে আমরা অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশী গন্যমান্য করিতেছি।

শ্রমিকের, কৃষক ও মজুরের—শূদ্রের দান ও স্থান সমাজে অনেকখানি; কারণ ইহারা হইতেছে প্রথম বা আদিবর্ণ। শূদ্র সমাজের প্রতিষ্ঠা, সমাজের দেহখানি সে গড়িয়া দিয়াছে, সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। একটা মানব-সঙ্ঘের ন্যূনতম প্রয়োজন যাহা তাহারই আয়োজন করিয়া দিতেছে শূদ্র—শূদ্রের আর এক নাম, উপনিষদের মতে, তাই পূষণ্ বা পোষণ করে যে। কিন্তু কেবল শূদ্রবর্ণ দিয়াই একটা সমাজ গঠিত হয় না—উন্নততর সমাজে আরও অন্যান্য গোষ্ঠী অব্যর্থভাবে আসিয়া দেখা দিয়াছে, ইহাদের সংখ্যা অল্প বা কর্ম্মের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র হইলেও সমাজের পক্ষে ইহাদের প্রয়োজন যে কম এমন নয়।

বোলশেভিকিরা আদর্শ সমাজ অর্থে বুঝিতেছেন শ্রমিকদের জোট। কিন্তু এই রকম সমাজের কতকটা কাঠাম আমরা দেখিতে পাই আছে আদিম মানুষের মধ্যে, এমন কি কয়েক শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেও তাহার কিছু ছায়া মিলে। সমাজের প্রথম অবস্থায় ব্যবস্থা বোধ হয় এই ধরণেরই

ছিল—যখন সমাজের প্রত্যেকে শরীরের শ্রম দিয়া সমাজকে গড়িয়া তুলিয়াছে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। মানুষ যখন ছিল একান্ত প্রধানতঃ অন্নময় কোষে তখনই তাহার সমাজ কেবল এই প্রথম ও আদি বর্ণ দিয়াই গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু মানব সমাজের রূপান্তর সেইদিনই হইল যেদিন মানুষের গোষ্ঠী চেতনায় নামিয়া আসিল প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় পুরুষের এষণা ও তোষণা; সমাজে সে দিন গ্রাসাচ্ছাদনের সাধক-মণ্ডলীর সহিত আসিয়া দেখা দিল উন্নততর কর্মের সুচারু ভোগ বিলাসের সাধক মণ্ডলী।

শূদ্র সমাজের দিতেছে জীবন; কিন্তু এই জীবনের মহত্তর বৃহত্তর সার্থকতা হইতেছে অন্যান্য বর্ণের দান। ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য, বৈশ্যের ঐশ্বর্য্য—এই সকলই ত উন্নত পরিণত সমাজের যথার্থ মর্য্যাদা নির্ণয় করিতেছে। এই দ্বিজাতিরাই আদিম মানুষের সমাজকে মার্জ্জিত সংস্কৃত করিয়া আধুনিক সভ্য সমাজে পরিণত করিয়াছে। অবশ্য আধুনিক সমাজে এই সকল দ্বিজাতি তাহাদের আদি অবিকৃতরূপে আর নাই, তাহারা নানাভাবে বিকৃত অশুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের পরিবর্ত্তে দেখা দিয়াছে অন্যান্য ধরণের বর্ণ ও শ্রেণী। অর্থবলের দিক দিয়া সমাজে গড়িয়া উঠিয়াছে বড় বড় ব্যবসায়ী, জমীদার, মধ্যবিত্ত এই বিবিধ সম্প্রদায়; শিক্ষা সংস্কারের হিসাবে আবার দেখি আছে অভিজাত, ভদ্র প্রভৃতি শ্রেণী। সমাজে এই সকল যে গোষ্ঠী আবির্ভূত হইয়াছে, ইহারা কেবলই শয়তানের সৃষ্টি,—কেবলই অত্যাচারের উৎপীড়নের যন্ত্র মাত্র—বোলশেভিকিরা এই কথা প্রচার করিতেছে এবং এই মন্ত্র ধরিয়া সমাজে বিপ্লব ডাকিয়া আনিতে চাহিতেছে। কিন্তু সত্যই কি তাই?

ভদ্রের, ধনিকের বিরুদ্ধে অভিযান আজকাল একটা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়াই পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। ধনিকের, ভদ্রের অত্যাচার ছিল

যা আছে, কেহ অস্বীকার করিবে না ; কিন্তু ইঁহারাই এ যাবৎ সমাজে শিক্ষা সভ্যতার ধারা পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাও অস্বীকার করি কি রকমে ? ইঁহারাও সমাজের শক্তি বিশেষের প্রতিনিধি এবং এই শক্তি কেবল যে অত্যাচারের অপকারেরই জন্যই প্রযুক্ত হইবে এমন কি কথা আছে ? অত্যাচারী যে, তাহার শাসন হৌক, আপত্তি নাই ; কিন্তু বন্ধু যে, ভ্রাতা যে, সমাজের দেশের সম্মিলিত জীবন যাহার সাহচর্য্য প্রয়োজন তাহাকে কেবলই শাসনের দ্বারা শত্রু করিয়া তোলা সম্পূর্ণ আর এক কথা।

আগে সমাজে অত্যাচার ছিল, মানিলাম : সে অত্যাচার হইতেছে দেহের উপর মাথার অত্যাচার। কিন্তু আজ বোলশেভিকিও আনিয়া দিতেছে আর এক অত্যাচার—মাথার উপর দেহের অত্যাচার। আগে ছিল বহুর উপরে অল্পের অত্যাচার ; ইহা অপেক্ষা আমরা আজকাল বিশ্বাস করিতেছি অল্পের উপর বহুর অত্যাচার অনেক ভাল। প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রতিহিংসা হিসাবে ব্যাপারটি স্বাভাবিক বটে—কিন্তু সমাজের কল্যাণের পথ যে ঐ দিকে তাহা মনে হয় না।

বোলশেভিকির বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ, গোড়া হইতেই তাহারা ধরিয়া লইয়াছে যে মাথার সহিত দেহের, অল্পের সহিত বহুর সংঘর্ষ হইতেছে প্রকৃতির অকাট্য নিয়ম। বোলশেভিকি একটা প্রমাদ-চক্রে ঘুরিয়া চলিয়াছে—নিজেরাই যে ঝগড়াকে ডাকিয়া আনিয়াছে, সেই ঝগড়াকেই আবার তাহারা নিজের সাফাইর জন্য সাক্ষী মানিতে চাহিতেছে ; শ্রদ্ধাই যেখানে এই যে, সমাজ প্রতিষ্ঠিত দ্বন্দ্বের রেষারেষির উপর তখন তেমন সমাজে দ্বন্দ্ব রেষারেষি যে ফুটিয়া উঠিবেই, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

এই সংঘর্ষ, এই প্রতিযোগ ইউরোপের সমাজে অনিবার্য্য হইলেও

হইতে পারে। কারণ ইউরোপীয় মানুষের প্রকৃতি যেমন আলাদা, তাহার সমাজের বিবর্ত্তন বরাবরই ঘটিয়া আসিয়াছে অনেকখানি এই সংঘর্ষের ভিতর দিয়া। চর্চ্চ, ফিউডলভুস্বামী, রাজা, তারপর জনসাধারণ ইউরোপীয় সমাজের এই চারি শ্রেণী বিভিন্ন যুগে একের পরে অন্য যে একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে তাহা হইয়াছে একটা দারুণ দ্বন্দ্বের যুদ্ধের ফলে। এই ধারা অনুসরণ করিয়া তাই বর্ত্তমান যুগে আবার দেখিতেছি জনসাধারণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া সমাজের কর্ত্তৃত্বের জন্য দ্বন্দ্ব সুরু করিয়াছে—একদিকে দাঁড়াইয়াছে বুর্জ্জোয়া মধ্যবিত্ত অন্যদিকে বোলশেভিকি।

ইউরোপের পক্ষে এই কর্ম্মগতি হয়ত স্বাভাবিক ; কিন্তু ভারতে তাহার আমদানি করিবার চেষ্টা পরধর্ম্মের উপর লোভ ছাড়া আর কি নাম দিব ? ভারতের বিবর্ত্তন-ধারা অন্য প্রকারের, ভারতের সমাজ গঠিত হইয়াছে ভিন্ন ছাঁচে। এখানকার মন্ত্র হইতেছে সমবায়, সহযোগ—বহুল এবং বিচিত্র শক্তি ধারার সামঞ্জস্য। ভারতের চেতনার এই বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার ধর্ম্মে এবং তাহার সমাজে। অন্যান্য জাতির বিবর্ত্তন চলিয়াছে একটা সোজা এক রোখা গতি ধরিয়া কিন্তু ভারতের বিবর্ত্তন বহুদিকে হাত বাড়াইয়া, বহু মুখে ঘুরিয়া ফিরিয়া তবে অগ্রসর হইয়াছে। অন্যান্য দেশে সমাজ নিজের মধ্যে নানা শক্তি-সঙ্ঘের স্বাতন্ত্র্য, পৃথক পৃথক স্বার্থকতা সহ্য করিতে পারে নাই, তাহার চেষ্টা হইয়াছে একটিমাত্র শক্তির কবলে আর সকলের অস্তিত্ব লোপ সাধন করা। কিন্তু ভারতের সমাজেই দেখি স্তবকে স্তবকে বিন্যস্ত যত বিভিন্ন রকমের গোষ্ঠী তাহার নিজের ভিতর হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে অথবা আসিয়াছে বাহিরের নানা রাজ্য হইতে। ভারত একাকার চাহে নাই, ভারত চাহিয়াছে ঐক্য। মানুষের মধ্যে যে বহুল বিচিত্র প্রেরণা গোষ্ঠীজীবনে অভিব্যক্তি চাহিতেছে

তাহাদের প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয় সার্থকতা এবং সকলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য যাহাতে সম্ভব হয় তাহারই একটা ব্যবস্থা আমরা পাই ভারতের বর্ণাশ্রমী সমাজে।

বোলশেভিকির লক্ষ্য অবশ্য এই রকম জটিল বহুতন্ত্রী সমাজ নয়; কিন্তু নানা গোষ্ঠীসম্বলিত দেশ মাতৃকার পূজারীও তাহারা নয়। সারা পৃথিবী ধরিয়া সকল দেশের সকল জাতির সকল সমাজের এক শ্রমিক-শ্রেণীরই মধ্যে তাহারা চাহে জোট বাধা, সৌভ্রাত্র্য স্থাপন। তাহাদের আদর্শ দেশসাধনার অপেক্ষা বৃহত্তর, তাহারা বলে; দেশের সেবক তাহারা এইজন্যে, যে সর্বাগ্রে সেখানে শ্রমিক রাজ্য স্থাপন করিয়া তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তবে সারা ভূমণ্ডলে তাহাদের আধিপত্য সহজে প্রসারিত করিয়া দিতে পারিবে। দেশ হিসাবে দেশের নিজস্ব সত্য ও সিদ্ধি কিছু আছে কিনা, অন্যান্য গোষ্ঠীর সাহচর্য্য দেশের বা বিশ্বের সেবায় প্রয়োজন কিনা—এই প্রশ্ন বা এই ধরণের সম্ভাবনা বোলশেভিকির চেতনার সীমানার মধ্যে আসে না।

কিন্তু—Those who by the sword, shall perish by the sword—সংঘর্ষকে আশ্রয় করিয়া বোলশেভিকি দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে, এই সংঘর্ষেরই দরুণ যদি তাহাদের পতন হয়, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার নাই। অবশ্য সহযোগ কথাটি যে বোলশেভিকদের মন্ত্রে আদৌ নাই তাহা নয়—বোলশেভিকিরা চায় নিজের বিশেষ দলটির মধ্যে নিবিড় সহযোগই দৃঢ়বদ্ধ জোট; কিন্তু এই জোটের, এই সহযোগের উদ্দেশ্য অপরের সহিত যুদ্ধ করা যতখানি, আপনার সত্য ধর্ম্ম ও সিদ্ধির সন্ধান ততখানি নয়। সমস্ত চেতনাটি মনোভাবটি যেখানে প্রতিযোগের, দ্বন্দ্বের, সংঘর্ষের মধ্যে সঞ্জাত লালিতপালিত, সেখানে কোনরূপ সহযোগ মিলন সামঞ্জস্যই স্থাপন করা কঠিন হইয়া পড়ে। ফলতঃ দেখিতেছি না কি, যে যুদ্ধ ঘোষণা

করিয়া বোলশেভিকি-শ্রমিকেরা দাঁড়াইয়াছিল ধনিকের বিরুদ্ধে. সেই শ্রমিকেরাই আবার ভাগ ভাগ হইয়া আজ আত্মকলহে মগ্ন—ট্রটস্কির সহিত ষ্টালিনের যে রেষারেষি তাহার অর্থ সহরের সহিত গ্রামের, মজুরের সহিত কৃষকের রেষারেষি ? বোলশেভিকির সমাজে এই নূতন আত্মকলহই হইয়া উঠিয়াছে দারুণ সমস্যা। এই সকল নানা কেন্দ্রাভিমুখী শক্তিদিগকে এক সঙ্গে বাঁধিয়া একমুখী করিয়া ধরিবার জন্য, বোলশেভির ক্ষুদ্র নেতৃ-সঙ্ঘকে যে কি কঠোর শাসন, এমন কি স্থানে স্থানে অত্যাচারেরই আশ্রয় লইতে হইয়াছে, এই তথ্য কাহারও অবিদিত নাই।

আমরা এমন কথা বলি না, কোন সমাজ সংঘষকে একেবারেই এড়াইয়া চলিতে পারে। সমাজের বিবর্ত্তন চলিবে পরম শান্তি, একান্ত সৌহার্দ্দ্য, নিবিড় প্রেমের ভিতর দিয়া—এই রকম আরামের ও সুবিধার কল্পনায় আমরা আস্থা স্থাপন করিতেছি না। সমাজের অতীত এমন ঘটনার প্রমাণ দেয় নাই, মানুষের বর্ত্তমান স্বভাবও এই ধরণের সম্ভাবনার কোন আশা দেয় না। কিন্তু কথা তাহা নয়। কথা এই, সংঘর্ষের পিছনে থাকা চাই একটা ঐক্যের মন্ত্র ; প্রতিযোগকেই লক্ষ্য করিয়া চলা নয়, চলা উচিত সহযোগকে লক্ষ্য করিয়া এবং সেইজন্য গৌণভাবে যদি প্রতিযোগ প্রয়োজন হয় তবেই তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করা।

জিজ্ঞাসা করিতে পার, কে নির্দ্দেশ করিয়া দিবে এই পর্য্যন্ত সহযোগের সীমানা আর এই হইতে প্রতিযোগ মঞ্জুর ? বিপুল বৃহৎ যত আন্দোলন তাহাদের উপর কাহারও হাত নাই, তাহারা চলে নিজের তোড়ে ও জোরে —কোথায় কি ভাঙ্গিবে, আর কোথায় কি রাখিবে, তাহার বিধান কেহই দিতে পারে না। সত্য কথা ; কিন্তু বৃহৎ আন্দোলনেরও আছে একটা মূল ভাব, একটা অন্তর-গত ঈরণা—এবং এই বস্তুটিরই উপর নির্ভর করে বাহিরের সমস্ত প্রকাশ—ধারার ভঙ্গীটি। যে আন্দোলনের হৃদ্দেশে

রহিয়াছে একটা গভীর সহযোগের অনুপ্রেরণা, তাহা আপনার ভিতর হইতেই সহযোগের ও প্রতিযোগের যথার্থ সীমানা ঠিক করিয়া চলে।

সে যাহা হউক, যে সকল গোষ্ঠী-আন্দোলন মুখ্যতই দ্বেষ হিংসার উপ্রর প্রতিষ্ঠিত, প্রায়ই দেখি তাহারা আপন বৃহত্তর সত্যকার কল্যাণের পথ ছাড়িয়া দিয়া আশু সুবিধার জন্য বা প্রতিহিংসার চরিতার্থতার প্রলোভনে পড়িয়া মিতালী স্থাপন করিয়াছে আপন সমাজের যথার্থ বিরুদ্ধাচারী শক্তির সহিত। দক্ষিণী অ-ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণকে জব্দ করিবার জন্য দেশের কথা ভুলিয়া কি রকমে বিদেশীরাজের কোলে গিয়া পড়িয়াছেন, মুসলমানেরাও গোষ্ঠী হিসাবে অনেক সময়ে হিন্দুর প্রতি অসদ্ভাব বশতঃই স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন—তাহা আমাদের কাহারও অজানা নাই। সেই রকম ভদ্রের শিক্ষিতের ধনিকের অভিজাতের বিরুদ্ধে আক্রোশবশতঃ এবং নিজেদের সাময়িক সুখ সুবিধার জন্য আমাদের দেশের শ্রমিকেরাও পাছে ঐ একই পথ অনুসরণ করিয়া চলেন—এই আশঙ্কাও আমাদের হইতে পারে।

বোলশেভিকিরা শ্রেণীগত স্বার্থের—কেবল জড় প্রয়োজনের বন্ধনে জগতের সকল "শূদ্রকে" এক করিতে চাহিতেছে। বাহিরের জীবনে দেশকে ডিঙ্গাইয়া, অন্তরের জীবনে অধ্যাত্মকে অস্বীকার করিয়া, তাহারা যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাচ্ছন্দ্যের জগৎ স্থাপন করিতে চাহিতেছে তাহা খুব সম্ভব বলিয়া আমরা বিবেচনা করি না, সম্ভব হইলেও বাঞ্ছনীয় মনে করি না। *

* অনেকেরই বোধ হয় ধারণা বোলশেভিক রাজত্ব হইতেছে একটা চমৎকার গণতন্ত্র অর্থাৎ এখানে দেশের যাবতীয় কৃষক-মজুরেরা মিলিয়া তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সাহায্যে নিজেদের জন্য নিজেরাই নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। বোলশেভিকির "আদর্শ" কতকটা ঐ ধরণের হইলেও হইতে

আজ যে আমি বোলশেভিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছি, ইহার বীজ বহু পূর্ব্বে উপ্ত হইয়াছে, ধীরে ধীরে ইহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে ; তবে যে অনুকূল আবহাওয়া পাইয়া ইহা সম্প্রতি শাখা-প্রশাখা মেলিয়া দিয়াছে, চারিদিকে ছায়া ফেলিয়া চলিয়াছে, তাহা হইতেছে— মহাত্মা গান্ধীর দান। কথাটা আশ্চর্য্যের নয়, বুঝাইয়া বলিতেছি।

পারে ; কিন্তু বর্ত্তমানে বস্তুতঃ যে ব্যবস্থা সেখানে স্থাপিত হইয়াছে তাহা হইতেছে মুষ্টিমেয়ের একচ্ছত্র কর্ত্তৃত্ব ; শাসন পদ্ধতি হিসাবে ইহার এক তুলনা ইতালীতে মুসোলীনির ফাসিষ্ট রাজ। প্রথমতঃ সমস্ত কৃষক শ্রেণীটিই বোলশেভিকি সঙ্ঘের বাহিরে পড়িয়া আছে—শুধু বাহিরে পড়িয়া নাই ক্রমে ইহারাই বোলশেভিকি একতান্ত্রিক তন্ত্রের পরম বাধা হইয়া উঠিতেছে ; বোলশেভিকি রাজ যে ইহারা আপাততঃ মানিয়া চলিয়াছে তাহার কারণ বোলশেভিকিরা তাহাদের আদি তত্ত্বগত উত্তুঙ্গ আদর্শকে খাট করিয়া একটা রফায় আসিয়াছে—কৃষকদিগকে ছোট ছোট ভূম্যধিকারী করিয়া দিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বোলশেভিকি-সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে প্রধানতঃ সহরের মজুরদের লইয়া—তাও সমস্ত মজুর সম্প্রদায় যোগদান করে নাই। তৃতীয়তঃ নিজেদের দলপুষ্টির জন্য বোলশেভিকি পাকা রাজনীতিকের পথ ধরিয়া অবলম্বন করিয়াছে দান ও দণ্ড এই দুই উপায়—"যথা, বোলশেভিকি পায় বেশী হারে মজুরী, কর দিতে তাহাদেরই হয় সব চেয়ে কম, অন্নবস্ত্রের অভাব আগে ভাগে তাহাদেরই মিটান হয়, থিয়েটারে, সিনেমায়, স্কুলে তাহাদেরই জন্য ভাল আসন ও প্রথম প্রবেশাধিকার ; আর বোলশেভিকি-সঙ্ঘের বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়া—বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া ত দূরের কথা— রুশ-দেশে বাস করা এক রকম অসম্ভব। বুর্জ্জোয়া রাজের যে সকল পাপের ও দোষের জন্য বোলশেভিকিরা তাহার বিরুদ্ধে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, একে

ভারতে রুশের প্রভাবের গোড়া খুঁজিতে গেলে, যাইতে হয় সেই প্রথম স্বদেশীরই যুগে বা তাহারও কথঞ্চিৎ পূর্ব্বে। দেশের স্বাধীনতা সম্ভব একমাত্র রাষ্ট্র বিপ্লবের সহায়ে এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের বনিয়াদ হইতেছে গুপ্ত সমিতি আর গুপ্ত সমিতির প্রধান কাজ গুপ্তহত্যা—দেশের কাজের এই ছক প্রথমে লওয়া হইয়াছিল বিশেষ ভাবে রুশেরই দৃষ্টান্তে। তবে ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত রুশীয় বিপ্লবীদের পার্থক্য ছিল এইখানে যে, রুশদের মধ্যে ধর্ম্মের, অধ্যাত্মের, ঐহিক সার্থকতা ছাড়া কোন উর্দ্ধতর বৃহত্তর আদর্শের আলো বা প্রেরণা দেখা দেয় নাই; কিন্তু ভারতীয়েরা বাহিরের দিক দিয়া, গীতার কথায়, "ঘোর কর্ম্মে" নিযুক্ত হইয়াও অন্তরে কি একটার শুদ্ধতার, নির্লিপ্ততার, সাত্ত্বিকতার, অধ্যাত্মেরই আবেগ অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়াছিল। *

কিন্তু কেবল বাহিরের, কেবল কার্য্যপদ্ধতির ছিদ্রপথে যে প্রভাব প্রবেশ করিল, ধীরে ধীরে তাহা অন্তরকে, ভিতরের ভাবকে পর্য্যন্ত ছাইয়া

একে আস্তে আস্তে অন্য দিক দিয়া সেই সকল পাপ ও দোষই আবার তাহাদের নিজেদের মধ্যেই প্রবেশ করিতেছে। অবশ্য বোলশেভিকির থিওরী হইতেছে এই—মুষ্টিমেয় অগ্রণীর একটা দৃঢ় কঠোর শাসন ভবিষ্যতের উদার সাম্য মৈত্রী-স্বাতন্ত্র্যের সোপান মাত্র। কিন্তু এই রকমে কেবল পিটুনির জোরে গাধাকে ঘোড়া বানাইবার আশা দুরাশা বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

* সেই যুগে ইউরোপীয় বিপ্লবতন্ত্রীদের সহিত পরিচিত অনেক ইউরোপীয় পর্য্যটক এবং ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী ভারতীয় বিপ্লবতন্ত্রীদের দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন; ভারতীয়দের আকৃতিতে প্রকৃতিতে কি একটা সহজ শান্তি, সরলতা, স্নিগ্ধতা এমন কি কোমলতা পর্য্যন্ত সর্ব্বদা পাওয়া যাইত—ইহারাই যে আবার কি করিয়া প্রাণ দিতেও দৃকপাত করে না, প্রাণ লইতেও কুণ্ঠিত হয় না, তাহা একটা ছিল বিষম প্রহেলিকা।

ফেলিতে সুরু করিল। শেষে কাজের ছকটি আমরা ভুলিয়া গেলাম বা পরিত্যাগ করিলাম কিন্তু তাহার সংস্পর্শ নূতন একটা দর্শন আমাদের মনে প্রাণে গড়িয়া দিয়া গেল। বিপ্লবী রুশের কার্য্যকলাপের সাথে সাথে আমরা পরিচিত হইলাম তাহার সাহিত্যের সাথে—আমাদের স্পর্শালু প্রকৃতি তাহাতে সহজে মুগ্ধ অভিভূত হইয়া পড়িল। ফরাসী সাহিত্যের কথা, স্কান্দিনাভীয় সাহিত্যের কথা আমরা অনেক শুনিতে আরম্ভ করিয়াছি অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন কালে; কিন্তু ইংরাজেতর ইউরোপীয় সাহিত্যের রসাস্বাদন আমরা প্রথম পাই রুশের নিকটে। রুশের সাহিত্য আমাদের তরুণের মধ্যে একটা মদিরার মোহ ছড়াইয়া দিয়াছে।

রুশে ভারতে একটা নিবিড় দরদের সম্বন্ধ গোড়াতেই ছিল সহজ ও স্বাভাবিক; কারণ উভয়েই উৎপীড়িত শৃঙ্খলিত মূক অসহায় একটা বিপুল বিশাল জনসঙ্ঘ—এক দেশে যদিও নিজের লোক হইতেছে শাসক আর অন্যটিতে পরদেশী, তবুও রাষ্ট্রীয় অধিকারের দিক দিয়া, সামাজিক ব্যবস্থার দিক দিয়া, শিক্ষা বা আর্থিক সচ্ছলতার দিক দিয়া, উভয়ত্রই সাধারণ অধিবাসীরা একান্ত দীন হীন দাস মাত্র। উভয় জাতির মধ্যে আবার স্বভাবতঃ বর্ত্তমান একটা প্রাচ্য-সুলভ অদৃশ্য দেবতার, কর্ম্মফলের, গতানুগতিকের উপর নির্ভর এবং আনুসঙ্গিক নিশ্চেষ্টতা ও ভাব-বিলাসিতা।

রুশ যখন কথা কহিতে শিখিল তখন অর্থাৎ তাহার সাহিত্যের আকাশ-বাতাস ভরিয়া উঠিল প্রধানতঃ অবরুদ্ধের নিঃশ্বাসে, পতিতের আশা-নিরাশায়, মুমূর্ষুর আকাঙ্খার আক্রোশে, হতাশের স্বপ্নে বিভীষিকায়। যাহা সুস্থ স্বাস্থ্য-প্রদ, যাহা প্রফুল্ল প্রসাদগুণাত্মক, যাহা শ্রদ্ধাবান ও আস্তিক্য-বুদ্ধিপ্রসূত তৎপরিবর্ত্তে সেই হাওয়ায় দেখা দিল একটা গুমোট অভিমান—মানুষের স্বভাবের উপর, ভগবানের বিধানের

বিধানের উপর। অনুরূপ অবস্থা, অনুকূল মনোভাবের কল্যাণে ভারতের তরুণেরাও সহজে এই রুশীয় "ভোড্‌কা" আনন্দে আগ্রহে পান করিতে সুরু করিল। ডষ্টয়ভেস্কি, টলষ্টয়, গর্কি তাহাদের শিরায় শিরায় রক্ত আরও রক্তিম, আরও উদ্বেল করিয়া ধরিল। ভারতীয় চিত্তের ও চেতনার যে নিজস্ব প্রসন্নতা সাত্ত্বিকতা তাহা এই ভাবে আবিল হইয়া উঠিল।

ইহার পরেই আসিলেন গান্ধীজী তাঁহার "টলষ্টয়ী" তন্ত্র লইয়া। অনেক অবিলতা সত্ত্বেও রুশের জাতিগত স্বভাবে, সাধারণ লোকের মধ্যে ছিল একটা অন্তর্মুখী ভাবুকতা, একটা মিস্‌টিক আবেশ—ইহার অনেকখানি উড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন টলষ্টয় তাঁহার প্রখর তর্কবুদ্ধির কিরণ-সম্পাতে। অবশ্য টলষ্টয় এবং তাঁহার অনুসরণে গান্ধীজী বোলশেভিকির মত একান্ত জড়বাদী নাস্তিক হইয়া পড়েন নাই, কিন্তু তাঁহারা এই পথেরই একটা ধাপ। তাঁহারা "নৈতিক" হইতে পারেন, কিন্তু ভারত যাহাকে "আধ্যাত্মিক" বলিয়া বুঝে সেই বস্তু তাঁহাদের মধ্যে খুব বেশী আছে কি না সন্দেহ। টলষ্টয় খৃষ্ট-ধর্ম্মের যে নিগূঢ় সাধনা তাহার খবর বিশেষ কিছু রাখেন নাই *—খৃষ্ট ধর্ম্মের যাহা গুহ্য, যাহা অন্তরাত্মার বস্তু সেটি কাটিয়া ছাঁটিয়া তিনি ধর্ম্মকে কতকগুলি নৈতিক বিধি নিষেধে পর্য্যবসিত করিয়াছেন—তাহাকে যুক্তিবাদের তর্কবুদ্ধির ছাঁচে চালিয়াছেন, rationlised করিয়া দিয়াছেন। গান্ধীজীও অহিংসা সত্যবাদিতা ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন কিন্তু ইহাদের

* খৃষ্টধর্ম্মের মিস্‌টিক দিকটা এক সময়ে টলষ্টয়ের চিত্তে ফুটিয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু সম্যক ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ তাহা পাইল না মনের যুক্তির তর্কবুদ্ধির ধর্ম্মের নীচে তাহা চাপা পড়িয়া গেল।

সত্যকার প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ যে "আত্মা" বা ভগবান তাহা তিনি বলিয়াছেন গৌণভাবে অস্পষ্টভাবে। তাঁহার "আত্মার বল" (Soul force) মনের জোর ছাড়া অত্যন্ত অন্য রকমের জিনিষ নয়। ফলতঃ গান্ধীজী এবং তাঁহার গুরু টলষ্টয় জড়বাদী না হইলেও আধ্যাত্মিকতাকে যতদূর সম্ভব জড়মুখী করিয়া, জড়ের ভাবে ও ভঙ্গিমায় গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা মানস-চেতনার স্তর অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই—জীবন যাপনের যে সূত্রাবলী দিয়াছেন তাহা হইতেছে তর্কবুদ্ধির কল্পিত, কিন্তু মনের বুদ্ধির অতীত "আত্মা"র চিন্ময় ধর্ম্ম তাহাতে ধরা দেয় নাই। অন্য কথায় আমরা বলিতে পারি, গান্ধীজী তথা টলষ্টয়ের ধর্ম্ম অধ্যাত্মিক নয়—আত্মাকে তাঁহারা বাদ দিয়া নিম্নতর মানস লোকের দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাই তাঁহাদের ধর্ম্ম বড় জোর হইয়াছে আধিদৈবিক। পরে যাহারা আসিয়াছে তাহারা এই দেবতা-দিগকেও বিসর্জ্জন দিয়া সরাসরি গড়িয়াছে আধিভৌতিক ধর্ম্ম।

এই আধিভৌতিকের ধর্ম্ম যেমন একান্ত হইয়াছে স্থূল জীবনের সার্থকতায় বা গ্রাসাচ্ছাদনের সাধনা, তেমনি ইহার সাধকেরাও হইয়াছে একটি বিশেষ শ্রেণী বা বর্ণ—যাহাদের আছে বিশেষ গুণ ও কর্ম্ম যাহাদের আখ্যা হইতেছে শূদ্র। কার্য্যতও দেখি গান্ধীজী প্রচার করিয়াছেন শূদ্রের মহত্ত্ব শূদ্রের আভিজাত্য। তিনি নিজেই তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মের পরিচয় দিতে গিয়া গর্ব্বের গৌরবের সহিত বলিতেছেন যে তিনি হইতেছেন চাষী ও তাঁতী। আর এইখানেই আসিয়া গান্ধীজী বোল-শেভিকির হাতে হাত মিলাইয়াছেন। বোলশেভিকির মতনই গান্ধীজী ব্যবস্থা দিতেছেন যে সমাজের প্রত্যেককে হাতে হাতিয়ারে কাজ করিতে হইবে—অন্ততঃ যাহারা হাতে হাতিয়ারে কাজ করিবে, যাহারা চাষী মজুর তাহারাই সমাজের শ্রেষ্ঠ বর্ণ, তাহাদের

বৃত্তিই সকলের উপরে, সুতরাং তাহাদের মর্য্যাদা (পদের ও অর্থের দিক দিয়া) সর্ব্বাপেক্ষা বেশি। লেখাপড়া বা ধ্যানধারণার উপরেও হইতেছে এই শারীরিক শ্রম এই manual labour তাং লেখাপড়া ধ্যানধারণা বাদ দিতেও গান্ধীজী প্রস্তুত তাহাতে যদি চরকার প্রতি মানুষের ভক্তি বাড়িয়া যায় বোলশেভিকিরাও চাহে লেখাপড়া ধ্যাণধারণার নিজস্ব সার্থকতা তেমন নয় যেমন শ্রমিকের শ্রমবৃত্তির সেবায় তাহাদের নিয়োগ। * একদিক দিয়া গান্ধীজী বোলশেভিকিদিগকে ছাড়াইয়া এক পা বেশি অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন—তাঁহার মতে শ্রমিকদিগের মধ্যেও আবার তাহারাই তত শ্রেষ্ঠ তাহাদেরই বৃত্তি তত গরীয়ান যাহারা বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় যত নীচে পড়িয়া যায়, যত হেয় বৃত্তি লইয়া আছে—অর্থাৎ মেথর হাড়ী, ডোম ইত্যাদি। অবশ্য এই তত্ত্বটি আসিয়াছে গান্ধীজীর সাধুভাব বা ধার্ম্মিকতার দিক হইতে। ফলতঃ গান্ধীজী ও বোলশেভিকিদের মধ্যে পার্থক্য একদিক দিয়া হইতেছে শুধু এইখানে—উভয়ের সামাজিক ছক বা ব্যবস্থা ব্যবহারের দিক দিয়া একই, তবে

---

* শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মত একজন শিল্পী মস্কো হইতে একবার ঘুরিয়া আসিয়া ধর্ম্মের সাহিত্যের সম্বন্ধে কি আদর্শ প্রচার করিতেছেন—

"There must be no more religious plays, for religion with its emphasis on Karma had duped the country too long. Those who needed help most, the poor starving millions of the land who did not know what it was to get one full meal a day, could be greatly assisted through the drama. It could teach them how to demand the right to obtain the necessities of life rightly belonging to them……"

গান্ধীজী তাহার উপর একটা নৈতিকতার ধাম্মিকতার প্রলেপ বা পোষাক দিয়া লইয়াছেন।

সুতরাং আজ আমরা, গান্ধীজীর পরে যাহারা দেশের সেবায় আসিয়া মিলিয়াছি গান্ধীজীর ধাম্মিকতা অবান্তর জিনিষ বলিয়া ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া দিতে সুরু করিয়াছি! তাঁহার সামাজিক ব্যবস্থাই শুধু গ্রহণ করিয়া চলিয়াছি। তাই এইভাবে বোলশেভিকির অতি নিকটে গিয়া যদি পড়িয়া থাকি, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই।

আজ ইউরোপ অর্থাৎ রুশবাদে ইউরোপের অবশিষ্ট অর্দ্ধ, যে শক্তিসঙ্ঘ ফলতঃ ইউরোপের ও তথা জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা তাহারা, বোলশেভিকিকে প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিতেছে, বলিতেছে বোলশেভিকি হইতেছে দারুণ অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলতা অত্যাচার বিভীষিকা। বোলশেভিকি সম্বন্ধে এই সব যত বিশেষনই প্রযুক্ত হোক না কেন, একথা ভুলিলে চলিবে না যে বোলশেভিকি ইউরোপেরই নিজের সন্তান, ইউরোপেরই ধর্ম্মের জের সে টানিয়া চলিয়াছে—বোলশেভিজিম হইতেছে ইউরোপের কর্ম্মফল, 'নেমেসিস (Nemesis) ইউরোপ যাহা লইয়া ইউরোপ, ইউরোপের বিশিষ্ট শক্তি যাহা, স্বধর্ম্ম যাহা ঠিক সেইটি ধরিয়া ধরিয়া, তাহারই চূড়ান্তে পৌঁছিতে চাহিতেছে বোলশেভিকি—বোলশেভিকির ইহাই ভিতরকার বল ও গৌরব। ইউরোপের ইউরোপত্ব তাহার তর্কবুদ্ধিতে, তাহার যুক্তিবাদে, তাহার মানস ইচ্ছা শক্তিতে, তাহার বিজ্ঞান সিদ্ধিতে—সজাগ সক্রিয় মনোময় পুরুষের বিগ্রহ হইতেছে ইউরোপ। মনের উপরে, হৃদয়ের গভীরে কি সত্য, কি রহস্য আছে, বা না আছে, ইউরোপ তাহার সংবাদ বেশী কিছু রাখে নাই—এক প্রাচ্যের সংস্পর্শে মাঝে মাঝে বাধ্য হইয়া এই সম্বন্ধে যা একটু সে সচেতন হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল; কিন্তু সে বস্তুকে জাগ্রত করিয়া রাখিতে, কার্য্যকরী শক্তি করিয়া তুলিতে কখন পারে নাই। ইউরোপের চেতনা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে মানস শক্তির মধ্যে; সে চাহিয়াছে মনের বিচার বিতর্ক দিয়া সকল সমস্যা মীমাংসা করিতে আর মনের বল দিয়া কর্ম্মের পথে চলিতে। এই যে যুক্তি তন্ত্র মন, ইহার বিশেষত্ব হইতেছে যে কোথাও কোন ধোঁয়া অস্পষ্টতা সে

রাখিতে চায় না, কোন সন্দেহ কোন দ্বিধার অবকাশ সহ্য করিতে পারে না। ইহার আলো রূঢ় রুক্ষ, চলে ঋজু রেখায়। জিনিষের আশে পাশে আলো আঁধারী রহস্যের দিকে ইহা মোটেও দৃষ্টিপাত করিতে চায় না। ইহার গতি কেবলই সম্মুখে, বাহিরের দিকে—জিনিষের যে সুস্পষ্ট স্থূল অবয়ব তাহারই সহিত ইহার পরিচয়, জিনিষের ততটুকু ও সেইটুকুই সে গ্রহণ করিতে চায় ও পারে যতটুকু ও যাহা আশু প্রয়োজনে অব্যবহিত কর্ম্মের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। যুক্তি তন্ত্র মন স্বভাবতই হইঁতেছে ঘোর বাস্তব তন্ত্র।

কিছুকাল পূর্ব্বে ইউরোপও সমাজে একটা আমূল পরিবর্ত্তন, এমন কি মানুষের প্রকৃতিতে একটা বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা দেখিতে সুরু করিয়াছিল জড়বিজ্ঞান যখন আবির্ভূত হইল তাহার অত্যদ্ভুত আবিষ্কার সব লইয়া তাহার নূতন ক্ষমতা লইয়া—দেখিয়া শুনিয়া ইউরোপ চমৎকৃত হইয়া উঠিল, নিজেকে ধন্য ধন্য মনে করিল, বলিয়া উঠিল, হাঁ পাইয়াছি এইবার—"ইউরেকা"—পৃথিবীকে উল্টাইয়া ফেলিবার কলকাঠি পাইয়াছি সেই হইতে তাহারএকটি ধারণা বদ্ধমূল হইয়া চলিয়াছে যে এই বিজ্ঞান—বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আর বৈজ্ঞানিক শক্তিই ভাবী মানুষকে তাহার সকল সার্থকতা, তাহার চতুর্ব্বর্গ লাভ করাইয়া দিবে। মানুষের ব্যক্তিগত আধিব্যাধি, তাহার সমাজগত দুঃখ দৈন্য সমস্ত দূর করিবে এই বিজ্ঞানের অবদান। এই বিজ্ঞানেই মানবজাতির জীবনে আনিয়া দিবে জ্ঞানের আলো, শক্তির হাওয়া, আনন্দের প্লাবন। ভূতলকে যদি স্বর্গের মত কিছু করিয়া তুলিতে হয় তবে তাহা পারিবে একমাত্র এই বিজ্ঞান।

অবশ্য প্রথম যুগের এই স্বপ্ন আজকাল হয়ত অনেকখানি মলিন হইয়া গিয়াছে; বৈজ্ঞানিকেরা সকলে আর তেমন জোর করিয়া ভরসা করিতে পারেন না যে কোন বিজ্ঞানেরই সহায়ে মানুষের জীবন তাহার

চরম সার্থকতায় পৌঁছিতে পারিবে। তবুও ইউরোপ যাহা কিছু চেষ্টা করিতেছে মানব-জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটাইতে, তাহার আশ্রয় বিশেষভাবে হইয়াছে এই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক তথা যান্ত্রিক শক্তি। মানুষকে রোগ হইতে মুক্ত রাখা, তাহাকে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান করিয়া তোলা—সুস্থ সন্তান সন্ততির জন্ম দেওয়া—যদি সম্ভব হয় জরাকেও জয় করা, দীর্ঘ জীবন ও যৌবন আয়ত্ত করা—মানুষের অশন বসন ভূষণের সম্যক উৎপাদন নির্ম্মাণ ও বণ্টন—অর্থের সৃজন আহরণ—মস্তিষ্কের সু-ব্যবহার, বুদ্ধির উৎকর্ষ, জ্ঞানের অর্থাৎ শিক্ষার প্রসার ব্যষ্টিগত ও সমাজগত জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার জন্য এই যাহা কিছু প্রয়োজন সমস্তের জন্য যাওয়া হইতেছে বিজ্ঞানের দুয়ারে; এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ধরিয়া, একান্ত যুক্তির ধারায় চলিয়া সকল সমস্যার মীমাংসা করা হইতেছে। যাহা কিছু ভ্রম প্রমাদ, যাহা কিছু নিরর্থক ও পরিত্যাজ্য বিবেচিত তাহারই নাম দেওয়া হয় অবৈজ্ঞানিক এবং অযৌক্তিক (unscientific and irrational)।

বিজ্ঞানের এত খানি পূজারী হইলেও ইউরোপ কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে বিজ্ঞানের পথে আপনাকে ঢালিয়া চালাইয়া দিতে পারিতেছে না। বিজ্ঞান ত সবে মাত্র ইউরোপের আসরে নামিয়াছে, তাহার পূর্ব্বে সমস্ত অতীতের যে একটা বিশেষ সংস্কারের ধারা চলিয়া আসিয়াছে, সেটিকে ইউরোপ হঠাৎ নাকচ করিয়া দেয় কি রকমে? ইউরোপের বুদ্ধি বিশেষ ভাবে যুক্তিবাদী হইলেও, তাহার প্রাণের মধ্যে আছে অনেক খানি প্রাচীন "অবৈজ্ঞানিক" "অযৌক্তিক" শিক্ষা দীক্ষার মতি গতির রেশ—প্রাচীনতর খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সাধনার, মধ্যযুগের আভিজাত্য-তন্ত্রের, ইদনীন্তন কালের বুর্জ্জোয়া তন্ত্রের অঙ্কুর সব। কর্ম্ম ক্ষেত্রে সকল সময়ে এই বিরোধী শক্তির প্রভাব সে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই বৈজ্ঞানিক যুগেও, বিজ্ঞানের নানা নির্দ্দেশ তত্ত্ব হিসাবে মানিয়া চলা সত্ত্বেও, বহু "কুসংস্কার," বহু জীর্ণ রীতি

নীতি তাহার ব্যষ্টির জীবনে, সমাজের ব্যবস্থায় অটুট রহিয়া গিয়াছে ; এবং এই সমস্তই তাহার সকল সম্মুখে-চলার মধ্যেও পিছন-টান হইয়া আছে। ইউরোপ হইতে কার্যতঃ বরং আমেরিকা অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক ও যুক্তি তান্ত্রিক হইয়া উঠিতে পারিয়াছে—ইহার এক কারণ বোধ হয় এই যে ইউরোপের মত তাহার উপর একটা দীর্ঘ অতীতের সংস্কার ভার নাই, নূতন ক্ষেত্রে নূতন রোপিত তরুর মত সম্পূর্ণ নূতন জীবন সে গড়িয়া লইতে পারিয়াছে, পিতৃপিতামহদের পাপের জের টানিয়া তাহাকে চলিতে হয় নাই। কিন্তু তবুও আমেরিকা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও "যৌক্তিক" হইয়া উঠিতে পারে নাই। শারীরিক সংস্কার-সম্বন্ধে সে অনেকখানি মুক্ত হইয়াছে বটে, দেহগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্য এক রকম যতদূর সম্ভব তত দূরই বিজ্ঞান হইতে বুদ্ধি হইতে আদায় করিয়া লইয়াছে ; কিন্তু প্রাণের কোণে, মনেরও কোণে কোণে বহু অন্ধকার তাহাতে জমা হইয়া আছে, বহু বিষয়ে এখনও সে অন্ধ প্রাচীন পন্থী কুসংস্কারাপন্ন হইয়া আছে। যে মনোবৃত্তির ফলে, পুরুষ ও নারীর ওজন সে সমান করিয়া দিয়াছে, তাহারই একটা দিক আবার Fundamontalistদের আদর করিয়া লইয়াছে।

এই খানেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বোলশেভিকি—ইউরোপে যাহা পারে নাই, আমেরিকাও যাহা অর্দ্ধ সমাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে,—বোলশেভিকি সেই অসাধ্য সাধন করিতে চাহিয়াছে এবং অনেক খানি যে পারিয়াছেও তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ তর্কপ্রতিষ্ঠ বুদ্ধির, যুক্তিবাদের প্রখর উগ্র আলোকে বোলশেভিকি যেমনটি দেখিয়াছে বুঝিয়াছে ঠিক সেই মাপে মাপে মানুষকে সমাজকে সে ঢালিয়া সাজিতে বসিয়াছে—কোন রকম দ্বিতীয় বৃত্তিকে সে আমলেই আনিতে চায় নাই, কোন সংশয় কোন দ্বিধা কোথাও আসিয়া যে তাহার প্রচেষ্টাকে খণ্ডিত দুর্ব্বল করিয়া দিবে এমন অবসরই সে দিতে চায় নাই। বোলশেভিকির সমস্ত সাধনা তাই

ঋজু, সুদৃঢ়, একমুখী। যুক্তি বলিয়া দিতেছে, বিজ্ঞানে প্রমাণ করিতেছে, ভগবান নামে কোন বস্তু নাই, অতীন্দ্রিয় অতিমানস কোন লোক নাই, "ধর্ম্ম" বা আধ্যাত্মিকতা হইতেছে এক ছত্রপ্রভুত্বপ্রয়াসীর গঠিত সাধারণ মানুষকে ঘুম পাড়াইবার, দাস করিয়া রাখিবার মন্ত্র মাত্র। তেমনি নৈতিকতা—সুরুচি সদাচার নামে পূজিত যে সব কর্ত্তব্যের বিধি নিষেধ তাহারাও অনেকে হইতেছে "বুর্জ্জোয়া"-সংস্কারের সৃষ্ট কুহেলিকা। মানুষকে প্রকৃতিকে দেখিতে হইবে খোলা চোখে, কর্ত্তব্যের আদর্শ খুঁজিতে হইবে রূঢ় সত্যের, বাস্তবের তাগিদের মধ্যে। বিজ্ঞানে এই শিক্ষা দিতেছে, যুক্তি ইহারই সমর্থন করিতেছে। প্রকৃতির প্রথম তাগিদ বুভুক্ষা, জীবনের বনিয়াদ হইতেছে তাই অন্ন—এই অন্ন ব্যবস্থার অনুসারেই সমাজের সমগ্র কাঠামটি গড়িয়া দিতে হইবে—স্বরাজের আসল নাম হইতেছে "অন্ন-রাজ।" আর অন্নের আয়োজন ও আহরণ করিতে হইবে সংগ্রামের ভিতর দিয়া—জীবন-ধারণ হইতেছে যুদ্ধ, এখানে যোগ্যতম যে তাহারই হয় উদ্বর্ত্তন। এত দিন ধরিয়া সমাজের একটি শ্রেণী (উপরের মুষ্টিমেয় "বড় লোকেরা") আর একটি শ্রেণীকে (যাহারাই হইতেছে অসংখ্য অথচ নামে "ছোট" লোক) পেষণ ও শোষণ করিয়া সকল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিজেদের জন্য আদায় করিয়া লইয়াছে; আজ চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে, এখন ছোট লোকের দিন আসিয়াছে, "বড়" লোককে ধরিয়া পেষণও শোষণ করিতে। দয়ামায়ার, ন্যায়-অন্যায়ের সঙ্গত-অসঙ্গতের কথা এখানে কিছু নাই—প্রোলেটেরিয়েট অনুসরণ করিতেছে প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম। তারপর প্রকৃতির আর এক প্রধান তাদিগ হইতেছে স্ত্রী-পুরুষ, নরনারীর সম্বন্ধে। কিন্তু -বুর্জ্জোয়ারা এই সম্বন্ধে স্থির করিতে গিয়া সৃষ্টি করিয়াছে "বিবাহ" বলিয়া একটি সংস্কার; শুধু তাই নয়, তাহারা সৃষ্টি করিয়াছে প্রেম বলিয়া একটি বৃত্তি—দীন দুঃখীর কুলি মজুরের পরিশ্রমের ফল নিশ্চিন্তে উপভোগ করিতে করিতে

এই সব কবিতা কল্পনা মায়া মতিভ্রম লইয়া তাহারা অবসর কাটাইয়াছে, আলস্য ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু বাস্তবের দিক দিয়া, নির্জলা সত্যের দিক দিয়া দেখিলে কি পাই? বিজ্ঞানে কি বলিতেছে, নিছক যুক্তি কি দেখাইতেছে? পুরুষ নারীর সম্বন্ধে শুধু শরীরের ত্বকের সম্বন্ধ, একটি মুহূর্ত্তের সম্বন্ধ—ইহার বেশী কিছু নয়, অবশ্য ইহার, কমও কিছু নয়। এটিকে অগ্রাহ্য ত করিবারই নয়, কিন্তু তাই বলিয়া ইহার উপর রং চড়াইয়া, সাজ সজ্জা চাপাইয়া দিয়া ইহাকে বিপুল মহৎ-এবং বিরাট করিয়া তুলিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই মোটা সত্য সব মানুষ যদি স্বাভাবিক ও সাধারণ ভাবেই গ্রহণ করিতে পারে, আকাশ বাতাসকে যে ভাবে দেখে সেই ভাবেই দেখিতে পারে, তবে তাহার প্রকৃতি হইতে যে কত ক্লেদ ঝরিয়া যায়, কত ময়লা যে জমিবার আর অবসর পায় না, তাহার জীবন তাহার সমাজ যে কত সুস্থ কত সহজ হইয়া উঠে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সহজ, এই বাস্তব-তন্ত্র জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের জন্যই চাই শিক্ষা, জোর করিয়া শিক্ষা, সর্ব্বত্র শিক্ষা অর্থাৎ স্কুল পাঠশালা মিউজিয়ম বক্তৃতার ছড়াছড়ি। শিক্ষা অর্থই হইতেছে সহজ বুদ্ধির, প্রত্যক্ষের, ইন্দ্রিয়ের দেওয়া যে জ্ঞান—যাহা কর্ম্ম ক্ষেত্রে জীবনের যুদ্ধে কাজে আসিবে, ব্যবহারে লাগিবে। তত্ত্বালোচনা, দার্শনিকতা, ভাবুকতা, ভাব বিলাসিতা—এ সব হইতেছে "বুর্জ্জোয়া" মনোবৃত্তির ফল। বুর্জ্জোয়ারাই সৃষ্টি করিয়াছে এই কথা—জ্ঞানের জন্য জ্ঞান, art for arts' sake ইত্যাদি। বোলশেভিকিরা তাই তাহাদের স্কুলে প্রাচীন ইতিহাস কিছু শিক্ষা দেয় না—ইতিহাস হইতে প্রয়োজন জীবন্ত প্রেরণা, তজ্জন্য আধুনিক কালের ইতিহাস এবং তাহার যতটুকু প্রোলেটারিটদের কীর্ত্তি ও প্রয়াস লইয়া ততটুকুই শিক্ষণীয়। এই একমুখী এক রোখা—সময়ে সময়ে মনে হয়, দারুণ—বাস্তব বুদ্ধি বোলশেভিকি তাহার জীবনের

সকল ক্ষেত্রে সমানে প্রয়োগ করিয়াছে। দেশবাসীর স্বাস্থ্য চাই ? চাই তবে ডাক্তার ঔষধপত্র, হাসপাতাল সানাটোরিয়াম যথা তথা। আতুর ব্যাধিগ্রস্ত যে সে সন্তানের জন্ম দিবার অধিকারী হইতে পারিবে না—আইন আসিয়া তাহাকে আটকাইয়া ধরিবে। রুগ্ন দুর্ব্বল সন্তান যাহাতে না হয় তজ্জন্য সুপ্রজনন বিদ্যার বিধি নিষেধ সকলকে মানিয়া চলিতে হইবে—নতুবা তাহার স্থান হইবে কারাগারে। সকলের শেষে ও সকলের উপরে অর্থ সমস্যা। দেশের অর্থাৎ শ্রমিক বা প্রোলেটারিয়েট সম্পদায়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ অর্থবৃদ্ধি - সেই জন্য কলকারখানানায় বিপুল সমারোহ চাই, বিরাট আকার জিনিষের উৎপাদন নির্ম্মাণ চাই, সর্ব্বতোভাবে industrial হইয়া উঠা চাই। ফলতঃ বিজ্ঞানের ততখানিই সার্থকতা যতখানি এইরূপে সে মানুষের জীবন যাত্রায় স্বচ্ছলতা আনিয়া দিতে পারিবে। জড় বুদ্ধির দেওয়া মন্ত্র, বিজ্ঞানের দেওয়া অস্ত্র শস্ত্র, নূতন আশার উৎসাহ লইয়া বোলশেভিকি আজ অসীম সাহসে বেপরোয়া হইয়া ছুটিয়াছে সেই পথে, যেখানে ইউরোপ চলিতেছে ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে, এক পা অগ্রসর হইতেছে ত থামিতেছে ও পিছন ফিরিয়া দেখিতেছে বার বার।

বোলশেভিকির ফুৎকারে যুগে যুগে সঞ্চিত মানুষের অনেক কুসংস্কার হয়ত উড়িয়া যাইতে বসিয়াছে—হয়ত রূঢ় তর্কবুদ্ধির ঐ একমাত্র সার্থকতা। কিন্তু সংস্কারের সাথে সাথে অনেক কুসংস্কারের—অনেক নিত্যকার সম্পদের বীজ ও যে উড়িয়া যাইতেছে, তাহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা বোলশেভিকির নাই। বোলশেভিকি মানুষকে সমাজকে একটা চমৎকার যন্ত্রে পরিণত করিয়া ফেলিতে চাহিতেছে—বাহিরের কর্ম্মজগতের দিক দিয়া সুষ্ঠু সুগত সমর্থ—কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মার গভীরতর প্রকাশ নাই, নাই মানুষের দৈবী সম্পদের জ্যোতি। বোলশেভিকি মানুষের বাহ্যতম প্রকৃতি, জীবনের স্থূলতম আয়তন যাহা তাহার সমৃদ্ধি তাহার শৃঙ্খলার

ব্যবস্থা লইয়া ব্যস্ত। বোলশেভিকি যে সব সমাজ সমস্যার মীমাংসা দিয়াছে ও দিতেছে তাহা ঐ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ ; কিন্তু দেহ ছাড়িয়া, স্থূল প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া, জড় মস্তিস্ক ছাড়িয়া যতই উচ্চতর গভীরতর প্রদেশে যাইতে থাকি, ততই দেখি বোলশেভিকির সিদ্ধান্ত—সিদ্ধান্তটি তত না হোক যত বোলশেভিকি মনোভাব—হইয়া উঠিতেছে অনিশ্চয়তাসঙ্কুল, প্রমাদপূর্ণ, ভয়াবহ।

অবশ্য বলা যাইতে পারে, যাহা সে দিতে পারে, বোলশেভিকির নিকট হইতে ততটুকুই লইব—তাহার বেশী প্রয়োজন যাহা তজ্জন্য যাইব অন্যত্র। মুদির দোকান যদি হীরা জহরৎ সরবরাহ না করিতে পারে তাহাতে দোষের কিছুই নাই। সত্য বটে, কিন্তু মুদি যদি রাজপাটে বসিয়া আইন করিয়া দেয় হীরা জহরৎ বড়লোকের বড় মানুষের খোরাক, ও সব বাজে খরচ মুদির রাজ্যে চলিবে না ?

আসল কথাটা হইতেছে এই, মানুষের গোটা জীবন একটা অখণ্ড সৃষ্টি—একটা দৃষ্টি, একটা আদর্শ, একটা স্বপ্ন মূর্ত্তিমান হইয়া ধরা দিয়াছে মানুষের সাঙ্গাঙ্গ জীবনে, সমাজের সমগ্র আয়তনে। মানুষের খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা ও ধরণ ধারণ নির্ভর করে জগতকে সে কি দৃষ্টিতে দেখিতেছে সেই তত্ত্বের—সেই দর্শনের উপর।

মানুষের ব্যবহারিক জীবন ধনে ধান্যে স্বাস্থ্যে শৃঙ্খলায় ভরিয়া উঠুক, সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হোক গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সত্যকার সাম্য ও সমন্বয়—এই উদ্দেশ্যে বোলশেভিকির প্রয়াস যে একেবারেই নিরর্থক হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে চাই না, বলিতে চাই না বোলশেভিকির মীমাংসায় কোথাও কোন সত্য নাই। পূর্ব্বেই আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি, এখনও স্বীকার করিতেছি যে সমাজের বাহ্য শৃঙ্খলার নিয়মাবলী যে কাঠাম বোলশেভিকি যাহা দিয়াছে হয়ত তাহার মধ্যে এখানে ওখানে

ভাবী সমাজের দেহের একটা ছায়া কিছু পড়িয়াছে। কিন্তু সমাজের আসল সমস্যা ত সেখানে নয়। আসল সমস্যাকে বোলশেভিকি এড়াইয়া গিয়াছে। মানুষের মধ্যে আছে দুই অংশ—এক প্রাকৃত আর এক অতি প্রাকৃত। বোলশেভিকি মানুষের এই অতি প্রাকৃত অংশটি কাটিয়া ছাঁটিয়া দিয়াছে, সে নীচের প্রাকৃত অংশটুকু লইয়া পড়িয়া আছে। প্রাকৃতের সংস্কার চাই সমৃদ্ধি চাই—কিন্তু সেই সংস্কার সেই সমৃদ্ধির কল-কাঠি কোথায়? বোলশেভিকি বলিতেছে ঐ প্রাকৃতেরই মধ্যে—অতি প্রাকৃতটা মায়া মতিভ্রম—বিষম অন্তরায়। আমরা বলিব তাহা নয়, তাহা নয়—নেদং যদিদং উপাসতে। এ পারের সিদ্ধির ও কলকাঠি রহিয়াছে ঐ ওপারেরই মধ্যে। এই দুই পারের আদান প্রদান, ঐক্যও সামঞ্জস্য ঐহিকের মধ্যে যে সম্ভব তাহার কথঞ্চিৎ নিদর্শন ভারত দিয়াছিল তাহার জীবন-বিন্যাসে, তাহার সমাজ সংস্থানে।

বলিয়াছি বোলশেভিকির ব্যবহারিক ব্যবস্থার একটা ছায়া মাঝে মাঝে পাই ভাবি সমাজের দৈহিক আয়তনের। কিন্তু সেই ততটুকুও সফল ও সত্য হইয়া উঠিতে পারিবে না—কারণ যে চেতনা যে জীবন-ধারায় সত্য ও সফল সেই জিনিষ তদপেক্ষা নিম্নতর সঙ্কীর্ণতর চেতনা ও জীবন ধারার শক্তি দিয়া ও রূপ দিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা বোলশেভিকিরা করিতেছে। ফরাসী বিপ্লব ও ছিল "যুক্তি দেবীর (Goddess of Reason) ভীষণ পূজারী, তাহাও সেই দেবীর হাতে তুলিয়া দিয়াছিল গিলটিন-রূপী খড়্গ—কিন্তু তবুও এপর্য্যন্ত সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা সমাজে প্রতিষ্ঠীত হয় নাই। আজ বোলশেভিক প্রায় সেই একই পথে চলিয়া আনিতে চাহিতেছে কমিউনিজম (এজমালি-তন্ত্র]—এই প্রয়াসেরও ফল অন্যথা হইবে না।

বোলশেভিকির ব্যবহারিক ব্যবস্থা, যাহা সে করিতে পারিয়াছে বা যাহা সে করিতে চাহিতেছে তাহা, কিছু ভাল হোক বা সবই ভাল হোক—

তাহাতে বিশেষ আসে যাইবে না, ভবিষ্যতে সেই ব্যবস্থা কোন মনোভাবের অভিব্যক্তি, তাহা মোটের উপরে মানবজীবনের কি মূল্য কি ওজন ধার্য্য করিতেছে, ইহাই হইল প্রশ্ন। যেমন. ব্যকরণের সূত্রাবলী নিভু'ল ভাবে সর্ব্বাংশে মানিয়া চলিলেই রচনা যে উৎকৃষ্ট হয় তাহা নয়; লেখার উৎকর্ষ নির্ভর করে ষ্টাইল বা লেখার প্রাণের উৎকর্ষের উপর। প্রকৃত পক্ষে বোলশেভিকি-তন্ত্র একটা রাজনৈতিক বা সামাজিক শাসন—ব্যবস্থা মাত্র নয়—তাহা হইলে বোলশেভিকির সে বলও থাকিত না, সে বৈশিষ্ট্য ও থাকিত না। বোলশেভিকি আসলে হইতেছে একটা নূতন "ধর্ম্ম" সম্প্রদায়ের একটা "রিলিজিয়ন"এরই অভ্যুত্থান, বোলশেভিকির ষ্টাইল এইখানে। বোলশেভিকির বুদ্ধি খরযুক্তবাদী, তর্ক প্রতিষ্ঠ হইলে কি হইবে? প্রাণের যে ছাঁদ. মনের যে চাল দেখি প্রত্যেক নব সুসমাচারের প্রচারে. বোলশেভিকিবাদেও পাই সেই একই জিনিষ—একটি বিশেষ শ্রেণীর বা সঙ্ঘের আপন মতবাদে একনিষ্ঠ, এক রোখা, অন্ধ আবেগ, সকল উপায়ে তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত উৎসাহ, বিপুল পরিশ্রম, প্রয়োজন হইলে, আত্মবলি এবং আত্মপীড়ন (পর বলি ও পরপীড়ন পর্য্যন্ত)—এই বিশ্বাস যে বিশ্বমানবের মুক্তি সিদ্ধি সমস্ত এই পথে, কেবল এই পথেই; অন্য যাহারা অন্য পথে চলে তাহারা যে শুধু ভুল করিতেছে এমন নয়, তাহারা মানুষের শত্রু তাহারা শয়তানের অনুচর। বোলশেভিকিরা লেনিন কে খৃষ্টের ও অধিক করিয়া পূজা করিতেছে, মার্কসের গ্রন্থটিকে বাইবেলের অধিক ভক্তি করিতেছে, শ্রমিকদের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রভুত্ব তাহাদের নিকট Sermon on the Mount অপেক্ষাও অভ্রান্ত অব্যভিচারী বিধান হইয়া উঠিয়াছে। অথবা সাদৃশ্যটা আরও ভাল করিয়া দেখাইয়া দিবার জন্য বলিতে পারি—কার্লমাক্স হইতেছে বোলশেভিকির এক এবং অদ্বিতীয় খোদা আর লেলিন তাঁহার রসুল। বোলশেভিকির

কোরাণ হইতেছে Das capital তাহাদের চক্ষে এক শ্রমিক ছাড়া পৃথিবীর আর সকল মানুষই কাফের।

এই যে fanaticism ইহা বোলশেভিকির সকল সৃষ্টি প্রয়াসের গোড়া করিয়া দিতেছে—বার্টাণ্ড রাসেল এই কথা বলিতেছেন। আমি কিন্তু fanaticismকেও সমর্থন করিতে রাজি ছিলাম—কারণ উদার অনিশ্চয়তা নয় একটা দৃঢ় নিশ্চয়তার একরোখা আবেগই কিছু সৃষ্টি করিতে গড়িয়া তুলিতে সক্ষম, কিন্তু সেই fanaticismকে তাহা হইলে মানুষের অন্তরতম ঊর্দ্ধতম চেতনার স্তর হইতে উৎসারিত এক আশীর্ব্বাদ মাগিয়া লইতে হয়—বোলশেভিকি যে উপরের সে দৈবী-দ্বার সশব্দে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

বোলশেভিকির পাশ্চত্য সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন, বোলশেভিকির এই যে ধর্ম্মান্ধতা, ইহা সে পাইয়াছে তাহার প্রাচ্য-প্রকৃতি হইতে—কারণ, রুষের রক্তে রহিয়াছে অর্দ্ধেকেই এশিয়ার রক্ত। কিন্তু আমার মনে হয় বোলশেভিকির fanaticism আর প্রাচ্য fanaticisim বলিতে সচরাচর যাহা বুঝান হয় তাহা এক জিনিষ নয়। তথা-কথিত প্রাচ্য fanaticism "মধ্য-যুগে"ই যাহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখি, তাহা অনেকটা অসংস্কৃত প্রাণের দুর্ব্বার আবেগ—কিন্তু তাহা স্পষ্ট খোলাখুলি জিনিষ; তাহার মধ্যে মস্তিষ্কের, বুদ্ধিবৃত্তির বিচার বিতর্কের স্থান বেশি কিছু ছিল না, যৎ-সামান্য থাকিলেও সেই বস্তু তথায় বিশেষ সংযম আনিয়া দেয় নাই বা তাহাকে রাখিয়া ঢাকিয়া ধারতে চেষ্টা করে নাই। বোলভেকি প্রানে প্রাণে fanatic; কিন্তু এই fanaticism সে তর্কবুদ্ধির, যুক্তিবাদের, স্থূল দৃষ্টির বাহ্য প্রয়োজনীয়তার আটে ঘাটে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সাজাইয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ বোলশেভিকির fanaticism হইতেছে বলিতে পারি "scientific fanaticism"। প্রাচ্যের যে fanaticism তাহার নাম যদি হয় "ধর্ম্মান্ধতা," তবে পাশ্চাত্যেরও যে fanaticism আছে তাহার

নাম দিতে পারি "বিজ্ঞানান্ধতা," ধর্ম্মান্ধতার স্বরূপ হইতেছে হৃদয়ের বা প্রাণের একটা অনুভবকে আবেগকে প্রকাণ্ড করিয়া দেখা, সকল মানুষকে তাহা জোর করিয়া অনুভব করাইবার চেষ্টা এবং তাহা যাহারা না চায় বা না পারে তাহাদিগকে কোতল করা; বিজ্ঞানান্ধতারও স্বরূপ হইতেছে জড়-বুদ্ধির, বাহ্য প্রয়োজনের সিদ্ধান্তকে চরম সত্য মনে করিয়া, তাহারই কাঠামের মধ্যে তাহারাই সংকীর্ণ শক্তির জোরে জবরদস্তিতে বিশ্বের লীলাকে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা, তাহারই খাপে খাপে মানুষের স্বভাবকে সমাজের ব্যবস্থাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া গড়িয়া ধরিবার প্রয়াস—আর ইহাতে যাহাদের আপত্তি তাহাদিগকে বিকৃত মস্তিষ্ক, কুসংস্কারপূর্ণ, ধর্ম্মধ্বজী প্রভৃতি আখ্যা দিয়া সমাজের বাহির করিয়া দেওয়া। বৈজ্ঞানিক ইউরোপের বিজ্ঞানান্ধতা অনেক খানি মস্তিষ্কের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ ছিল বলিয়াছি, জীবনের প্রাণের মূল প্রেরণার উপর তাহার প্রভাব ছিল খুব স্তিমিত ও পরোক্ষ; বোলশেভিকির বৈশিষ্ট্য, ইউরোপের এই দ্বিধা, মনের ও প্রাণের মধ্যে যতটুকু বৈষম্য ছিল তাহা, একেবারে ঘুচাইয়া দিয়াছে—বিজ্ঞানন্ধতার সমগ্র বন্যা প্রাণের উপর জীবনের উপর নামাইয়া আনিয়াছে। যে কঠোর যৌক্তিক শিক্ষা দীক্ষা ও যান্ত্রিক সভ্যতার পূজারী ইউরোপ, বোলশেভিকি তাহারই পূর্ণমূর্ত্তি নামাইয়া সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

ইউরোপের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, প্রাচ্যের ও আছে তাঁহার নিজের বৈশিষ্ট্য। তবে ইউরোপের বৈশিষ্ট্যের কাছে প্রাচ্য তাহার বৈশিষ্ট্য বলি দিতে যাইবে কেন? প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্যের মূল হইতেছে ভারত; ভারতই ঐ বিশিষ্ট্য গড়িয়া দিয়াছে, সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, প্রসারিত করিয়া দিয়াছে এশিয়ার সর্ব্বত্র—প্রধানতঃ চীনে, জাপানে। জাপানের কথা ইতিপূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। ইউরোপের শিক্ষা গ্রহণ করিতে গিয়া, আধুনিক হইতে গিয়া, জাপান তাহার প্রাচীন প্রাচ্য-দীক্ষা ভুলিয়া যাওয়া প্রয়োজন মনে করে নাই। * আমাদের বা সেই প্রয়োজন হইবে কেন?

---

* সম্প্রতি অবশ্য জাপানেও দেখি একটা দুর্দ্দিনের ছায়া পড়িয়া আসিতেছে, ইউরোপ হইতে নানা ভাবধারা আসিয়া জাপানের প্রাচীন সংস্কৃতিকে আবিল করিয়া তুলিতেছে, তবুও ইহারই মধ্যে শুনুন তাহার চিন্তার নেতা, কর্ম্মের দিশারীর কথাঃ—

"While acquiring the knowledge of the things of the West we are still holding on to our memory of the lessons learned from our father's. We shall hearafter see that the lessons of the spritual civilisation of the Orient, when we still appreciate, are applied in directing our daily life, while enjoying the comforts of modern civilisation."

—Osaka Mainichi (জাপানের একরকম সর্ব্বপ্রধান সংবাদ পত্র)

একটা ধারণা খুব চলিত, প্রায় সর্ব্ববাদী-সম্মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে এই যে, ইউরোপের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে, ইউরোপকে জীবন যুদ্ধে হটাইতে হইলে ইউরোপের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উঠিতে হইবে। ঠিক এই কথাই মনে করিয়া বহুপূর্ব্বে আমাদের এক কবি আমাদিগকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন—

জপ তব আর যোগ-আরাধনা।
পূজা হোম-যাগ প্রতিমা অর্চ্চনা
এ সবে এবে কিছুই হবে না
তূণীর-কৃপাণে কর রে পূজা।
* * * *
এ সব দৈত্য নহে রে তেমন।

আর জাপানের উদাহরণ দিয়া এই কথাটিই আমরা প্রমাণ করিতে চাই। কিন্তু আমার একটি সন্দেহ এখানে আছে। জাপান যে রুশকে হটাইয়া দিয়াছিল, তাহা কতখানি ইউরোপীয় সাজসজ্জার জোরে, কত খানিই বা জাপানের প্রাচীন দীক্ষা, সনাতন ধর্ম্মের কল্যাণে? আমার বিশ্বাস ইউরোপীয় সাজসজ্জা জাপানের ছিল এই প্রাচীন দীক্ষার সনাতন ধর্ম্মের বাহ্য আশ্রয় অবলম্বন মাত্র।

জাপান যে এত সহজে, এমন সম্পূর্ণরূপে রুশের মত বিপুল বিভীষণ-শক্তিকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতে পারিয়াছিল তাহার মূল কারণ স্থূল অস্ত্র-শস্ত্রে। যথাযোগ্যতার মধ্যে ততখানি নাই, সে কারণ আরও গভীরে,—বাহিরের কর্ম্মজীবনের ক্ষেত্রে জাপান যে নামাইয়া আনিতে পারিয়াছিল তাহার প্রাচীন অন্তরাত্মার ধর্ম্মের কিছু প্রভাব, এই জন্য। রুশের উপর জাপানের যে জয়, এই দিক দিয়াই তাহার যথার্থ মাহাত্ম্য।

ফলতঃ জাপানের অভ্যুত্থান হইতে যদি কিছু শিখিবার থাকে তবে

তাহা ঠিক এই কথাটি। এশিয়া মহৎ ও সমর্থ ইউরোপের আসুরিক বলে নয় কিন্তু আর এক ধরণের দিব্য-বলে। ইউরোপের আসুরিক শক্তিকে যদি জয় করিতে হয়, তবে তাহা সম্ভব এই পথে। এক ইউরোপের অপেক্ষাও বৃহত্তর অসুর হইয়া—আর না হয়, সত্যকার দেবশক্তি অর্জ্জন করিয়া। প্রথম পথ দারুণ দুর্গম—সংঘর্ষের সন্তাপে অজ্ঞানের অকল্যাণের—বোলশেভিকেরা জগৎকে এই পথে লইয়া যাইতে চাহিয়াছে। তাহা ছাড়া এশিয়ার পক্ষে এই পথ পরধর্ম্মের পথ। দ্বিতীয় পথ এশিয়ার—ভারতের নিজস্ব পথ, স্বধর্ম্মের পথ, পরম কল্যাণ পরম স্বস্তি পরম সিদ্ধি তাহাতে। ভারতের আদর্শ কর্ম্মী, বিভূতি যাহারা, যাহারাই অসুর রাক্ষসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন তাঁহারা দেখি সকলে চিরকাল প্রথমে দেব শক্তির নিকট হইতে দিব্য অস্ত্র লাভ করিয়া তবে রণক্ষেত্রে নামিয়াছেন। আসুরিক শক্তি দিয়া অসুরকে জয় করা—কখন সম্ভব হয় আবার কখন না'ও হইতে পারে; আবার সেই জয় ক্ষণিকের জন্য হইতে পারে, স্থায়ী না'ও হইতে পারে। এই পথে একটা সন্দেহ অনিশ্চয়তা বরাবরই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু দেব-শক্তির দ্বারা অসুরের যে জয় তাহা অব্যর্থ তাহা সম্পূর্ণ চূড়ান্ত—এবং আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ ভারত দেব-অংশ-সম্ভূত।

তার পর আরও কথা, এশিয়ার ভারতের অভ্যুত্থানের আছে একটা বিশেষ অর্থ, একটা নিভৃত রহস্য। ভারতের অভ্যুত্থানের আছে একটা একান্ত প্রয়োজন, জগতের ক্রমপরিণতির একটা অবস্থান্তর ঘটাইবার জন্য। ভারত জাগিতেছে সৃষ্টির, প্রকৃতির এই প্রেরণার জোরে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনার জন্য। যেমন ব্যক্তির মূর্ত্তি ধরিয়া ভগবান আবির্ভূত হন যখন ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখা দেয়, যখন প্রয়োজন সাধুর পরিত্রাণ, দুষ্কৃতের বিনাস, ধর্ম্মের সংস্থাপন, ঠিক তেমনি আজ বিশ্বমাতা ভারত

-শক্তি রূপে প্রকট হইয়া উঠিতেছেন সমস্ত জগতে নূতন একটা জীবন, উৰ্দ্ধতর একটা চেতনা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, পৃথিবীতে অভিনব সমাজ স্থাপন করিতে।

আমাদের দেশ সেবার যত বিধি-ব্যবস্থা দেশের এই গভীরতর সত্য ও সিদ্ধির সুরে গ্রথিত নয়, যাহা কেবল গঠিত হইতেছে তর্কবুদ্ধির দ্বারা বা কোন না কোন স্বার্থের সেবায় বা খেয়াল বা শুধু অনুচিকীর্ষার ফলে তাহার ব্যর্থতা অনিবার্য্য, তাহা দেশের সমস্ত শক্তিকে চেতনাকে একমুখী না করিয়া খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া ধরিবে, শেষ সিদ্ধিকে বিলম্বিত করিয়া চলিবে।

ভারতের প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্যের কথা বলিলাম। কিন্তু ইউরোপেরই এক স্থানে আমাদের বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ একটি সত্য প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে, ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতেছে বোধ হয়, ইউরোপের ভবিষ্যৎ আশাবর্ত্তিকা রূপে। পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিয়া থাকা যদি আমাদের পক্ষে অসম্ভই হয়, তবে পাশ্চাত্যের পাশ্চাত্যতম যে দেশটি তাহার উপর বরং দৃষ্টিপাত করিলে আমরা সত্যকার পথের নির্দ্দেশ কিছু পাইব। আমি বলিতেছি আয়র্লণ্ডের কথা।

আয়র্লণ্ড তাহার রাজনৈতিক জীবনে, তাহার অর্থনৈতিক জীবনে যে যুগান্তর আনিয়া ফেলিতে পারিয়াছে তাহার মূল রাজনীতির অর্থনীতির বহু পশ্চাতে, অন্তরে একটা গভীরতর চেতনার মধ্যে। আয়র্লণ্ডের দেশ-সাধনার শিক্ষাই হইতেছে এই অধ্যাত্মের আলোকে ও প্রেরণার অধি-ভূতকে গড়িয়া তোলা বর্ত্তমানযুগেও একটা অসম্ভব বা ব্যর্থ চেষ্টা নয়। কবি মিস্টিক জর্জ্জ রাসেল (এ-ই) এই প্রয়াসের মূর্ত্ত প্রতীক। তিনি হাতে হাতিয়ারে দেখাইয়া দিতেছেন যে দেশের ব্যবহারিক জীবনের ঋদ্ধি, গ্রাসা-চ্ছদনের সুব্যবস্থা আনিতে হইলে ভগবানকে তাড়াইতে হইবে, অধ্যাত্ম-

সাধনাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, ঘোর জড়বাদী হইয়া উঠিতে হইবে, সমাজের মধ্যে অযথা একটা দারুণ সংঘর্ষ বাধাইয়া তুলিতে হইবে, এ সকলের কোনই প্রয়োজন নাই।

এক যুগে আমরা অবশ্য অধ্যাত্মের ধর্ম্মের মত নিষ্ক্রিয় যত তামসরূপ তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম; কারণ তখন আমাদের প্রাণের তেজই স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু অধ্যাত্ম বা ধর্ম্ম যে মূক পঙ্গু, বাস্তবে কর্ম্মহীন চলৎশক্তিহীন—"অপনিপাদ"—হইবেই, এমন কোন কথা নাই। বরং আজ যখন নব-যৌবনের সাড়া আমাদের ধমনীতে জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন ধর্ম্মের অধ্যাত্মের যে বীর্য্যময় ঐশ্বর্য্যময় রূপ তাহাই ত-প্রতিষ্ঠিত হইবে।

দুর্দ্দশাই ত এইখানে। অধ্যাত্মের আসল শক্তিকে, দেবতার প্রেরণাকে আমরা বাস্তবের জীবনের ক্ষেত্র হইতে যত দূরে সরাইয়া দিয়াছি, ততই ঘোর অধিভূতের, আসুরিক শক্তি সকল সেই স্থান আসিয়া অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আজ এই একথা তাই কি বুঝিবার অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে নাই, তদনুসারে আমাদের ব্যক্তিগত আমাদের গোষ্ঠীগত সকল প্রয়াস সকল সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করা অনিবার্য্য হইয়া কি উঠিতেছে না, যে অধ্যাত্ম কেবল বার্দ্ধক্যেরই সাধনা নয়, দেবতারা জীবনের ওপারেই শুধু বসিয়া নাই,—যৌবনের পূর্ণ প্রতিভা প্রকাশ পাইবে, জীবনের গভীরতম সার্থকতা লাভ হইবে অধ্যাত্মের চেতনায় শক্তিতে আনন্দে? আর এই অধ্যাত্মের সত্যে গঠিত অনুপ্রাণিত সাধকেরা সিদ্ধেরাই যে গোষ্ঠী যে সমাজ যতখানি গড়িয়া তুলিতে থাকিবে, তাহাদেরই জীবন-জ্যোতি যে আয়তন যে প্রতিষ্ঠান যতখানি প্রতিফলিত করিয়া ধরিতে পারিবে সেই আয়তন সেই প্রতিষ্ঠান, সেই গোষ্ঠী সেই সমাজ ততখানি উন্নত, তত আদর্শস্থানীয় হইয়া কি উঠিবে না।"

বোলশেভিকি যে জিনিষটি গড়িতে চাহিতেছে, বাস্তবিকই তাহা যদি সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠে, তবে মানুষের পক্ষে তাহার ফল খুব কল্যাণকর হইবে না। এই গঠনের দিক দিয়া বোলশেভিকির কি ত্রুটি তাহাই আমরা এ পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি। যে পরিপূর্ণ আদর্শ, যে দিব্যশক্তি মানুষকে, মানুষের সমাজকে নবপ্রাণ নবরূপ—নবজন্ম দিতে পারিবে তাহা বোলশেভিকির তন্ত্রে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বোলশেভিকির প্রয়োজনও যে কিছু ছিল না বা নাই, তাহা নয়। জগতে কোন বৃহৎ আন্দোলন, বিপুল বিপ্লব নিরর্থক হইতে পারে না—বন্যা, ভূকম্প, আগ্নেয়গিরি, মহামারির পর্য্যন্ত একটা সার্থকতা আছে। বোলশেভিকির সাধনা গঠনের দিক দিয়া সার্থক হয় নাই, তাহার সার্থকতা ভাঙ্গনের দিক দিয়া—মানবজাতিকে কি দিয়াছে তাহার জন্য নয়, কিন্তু মানবজাতিকে কি হইতে মুক্ত করিয়াছে তাহারই জন্য। নূতন গড়িবার চেষ্টা বোলশেভিকি অনেক কিছুই করিয়াছে ও করিতেছে, সে সকলের স্থায়িত্ব বা কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আমরা খুবই সন্দিহান হইতে পারি; কিন্তু পুরাতনকে সে যে ভাবে বা যতখানি ভাঙ্গিতেছে ও ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে তাহারই ফল হইবে সুদূরপ্রসারী। ভবিষ্যতের সত্যকার গঠনের সহায় যদি বোলশেভিকি হয়, তবে তাহাদের এই ভাঙ্গনের দিক দিয়া; তাহাদের নিজের নির্ম্মাণ বেশীর ভাগ অন্তরায়ই হইবার সম্ভাবনা। পুরাতনের বিপুল সৃষ্টি সব আকাশ বাতাস রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—বোলশেভিকি আসিয়া সেগুলি ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছে, নূতন সৃষ্টির জন্য অবকাশ করিয়া দিয়াছে, ইহাই হইল বোলশেভিকির আসল কার্য্য।

এই ভাঙ্গনের কর্ম্মেও কিন্তু বোলশেভিকির আছে একটা বিশেষত্ব। প্রাচীনের পুরাতনের মধ্যে যাহা জীর্ণ যাহা একান্ত প্রাণহীন, যাহা কেবল বর্ত্তিয়া রহিয়াছে নামে ও রূপে, তাহাকে ধূলিসাৎ করা খুব কঠিন নয়; এ কাজ প্রয়োজনীয় হইলেও, ইহাতে কৃতিত্ব খুব বেশী নাই। কঠিন হইতেছে পুরাতনের যে সকল নামরূপের পিছনে এখনও আছে শুধু অভ্যাসের জের নয়, কিন্তু সংস্কারের জোর, প্রাণের রসায়ন, তাহাদিগকে উৎপাটিত করা। বোলশেভিকি ঠিক এই প্রয়াসই করিয়াছে, বর্ত্তমানে যাহার প্রাণ আছে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া, এমন জিনিষেরও—এমন জিনিষেরই প্রাণ তাহারা কাড়িয়া লইতে চাহিয়াছে। আমাদের এই কথাটির গভীরতর অর্থ ক্রমশঃ স্ফুট হইবে; আগে আমরা বলিব কয়েকটি প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে বোলশেভিকির যে ভাঙ্গন অতি স্পষ্ট তাহারই কথা।

প্রথমতঃ রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে বোলশেভিকি ভাঙ্গিতেছে "নেশনত্ব"—যে নেশনত্বের অর্থ হইতেছে একটা জাতির সমষ্টিগত অহঙ্কার, দর্প, বুভুক্ষা, নিজের দেশকে সমৃদ্ধ স্ফীত করিয়া তুলিবার জন্য অপরের দেশকে আয়ত্তাধীন করা, শোষণ করা। প্রত্যেক জাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও জীবনধারা আছে এবং প্রত্যেকেরই অধিকার আছে স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে আপন আপন সার্থকতার পথ বাহিয়া চলা। গোড়ায় নেশনের ছিল এই অর্থ ও উদ্দেশ্য। নেশনের মূলকথা যে একটা সংহত রাষ্ট্রীয় ঐক্য তাহাকেই আশ্রয় করিয়া ইউরোপে একটা জাতির সমষ্টিগত সত্ত্বা সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল, সজ্ঞানে আপনাকে গঠিত নিয়ন্ত্রিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই নেশন-ভাবের মধ্য দিয়াই একটা দেশ তাহার সম্মিলিত জীবনে চাহিয়াছে পরিপূর্ণ আত্মবিকাশ। কিন্তু নেশনের এই কল্যাণময় রূপ শেষে বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। জড়-বিজ্ঞান একদিন

জগতের ব্যবহারিক জীবনে বিপ্লব আনিয়া দিল ; সেই বিপ্লবের ফলে, কল-কারখানা, দেশ বিদেশের সহিত আদান প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য উপনিবেশ-স্থাপন সব সহজ এবং লাভের ও লোভের বস্তু হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে "নেশন" পরিণত হইল "এম্পায়ারে।" বর্ত্তমান যুগে দুর্ব্বল জাতি, ক্ষুদ্র দেশের বিভীষিকাই এই এম্পায়ার রূপী নেশন।

ন্যাসানালিজিম্ এর যে বিকৃত বিকট রূপ, যাহার নাম "ইম্পিরিয়ালিজিম্" বোলশেভিকি দাঁড়াইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে। সকল জাতির যে সর্ব্বসাধারণ বা গণসঙ্ঘ তাহাদিগকে নিজের নিজের দেশের গণ্ডী মুছিয়া ফেলিয়া মানবতার মুক্ত-প্রাঙ্গনে মিলিত হইতে বলিতেছে। দেশকে দেশ হইতে পৃথক করিয়া রাখায়, একটা জাতির বিরুদ্ধে আর একটা জাতির অস্ত্রধারণে সেই সেই দেশের ও জাতির যে সাধারণ লোক তাহাদের কোন স্বার্থ নাই কোন লাভ নাই—স্বার্থ ও লাভ হইতেছে মুষ্টিমেয় কর্ত্তৃপক্ষের। ফলতঃ "নেশন" বা সাম্রাজ্য একটা যন্ত্র মাত্র—জনকয়েক ধনীর, প্রভুত্বলোভীর হাতে। রাষ্ট্র (State) জিনিষটাই এই শ্রেণীতে গড়িয়া তুলিয়াছে, নিজেদের শক্তি ও সম্পদ বাড়াইবার পাকা করিয়া তুলিবার জন্য, সর্ব্বসাধারণকে—চাষীকে মজুরকে, ধনের উৎপাদক, বলের উৎস যাহারা তাহাদিগকে ক্রীতদাস করিয়া রাখিতে।

এই ভাবেই Nationalism এর সাথে হাত ধরাধরি করিয়া আছে আবার Capitalism। এই রকমেই অর্থের দিক দিয়াও বর্ত্তমানের সমাজে একটা দারুণ অসাম্য দেখা দিয়াছিল ও বাড়িয়া চলিতেছিল ; তাই রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রের সাথে সাথে বোলশিভিকি ভাঙ্গন আনিতে চাহিয়াছে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে। বস্তুতঃ আধুনিকের রাষ্ট্রনীতিকে গড়িয়াছে, ধরিয়া আছে, জীবিত রাখিতেছে বর্ত্তমানের অর্থনীতি। রাষ্ট্রের তাহারাই পাণ্ডা, রাষ্ট্রীয় সন্ধি বিগ্রহের তাহারাই কর্ত্তা যাহারা নিজেরাই ব্যবসা

বাণিজ্য জগতে মহামহা রথী অথবা ইহাদের অনুচর ও হাতে-ধরা যন্ত্র। আজকালকার আন্তর্জ্জাতিক সকল সম্বন্ধ স্থির হইতেছে কয়েকজন অতি-ধনীর সিন্ধুক কি রকমে আরও ভরাট হয় সেই উদ্দেশ্যে। সমাজে এক দিকে তাই দাঁড়াইয়াছে অগাধ ধনের মালিক এক শ্রেণী আর একদিকে অসংখ্য দীন-দুঃখী—অথচ রহস্যের কথা এই যে, এই অসংখ্য দীনদুঃখীর পরিশ্রমের ফল আহরণ করিয়াই মালিকেরা কর্ত্তারা স্ফীত হইয়া চলিয়াছে। ধনের মালিক বলিয়া সমাজের মাথায় যাহারা চড়িয়া বসিয়াছিল বোলশেভিকি তাহাদিগকে উদ্বাস্ত করিয়া দিয়াছে ও দিতেছে—কারণ বোলশেভিকির কথা, সত্যকার মালিক হইতেছে তাহারা যাহারা গায়ের ঘাম ঝরাইয়া কাজ করিতেছে। তাহাদের পরিশ্রমের ফল সম্পুর্ণ তাহারাই উপভোগ করিবে, তাহাদের যত্নলব্ধ ধনে অন্য কাহারও অধিকার নাই।

অর্থনীতির সম্বন্ধে বোলশেভিকির থিওরি যাহাই হোক, যে তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া এই ক্ষেত্রে তাহারা ভাঙ্গনের আয়োজন করিতেছে তাহার মূল্য যাহাই হোক, সে কথা আমরা বিচার করিতেছি না। কিন্তু সমাজে ধনীর ও শ্রমীর মধ্যে, উপরের কয়েকজন ও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যে একটা দুর্ভেদ্য দেয়াল কেবলই গড়িয়া উঠিতেছিল, বাস্তবের ক্ষেত্রে তাহা যদি বোলশেভিকি কথঞ্চিৎ ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকে, অর্থের প্রবাহ সমাজের অঙ্গে অঙ্গে আরও সমানভাবে যাহাতে বহিতে পারে সে জন্য যদি বোলশেভিকিরা বাঁধ জঞ্জাল কিছু পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া থাকে তবে সেইটুকুই তাহাদের সার্থকতা।

বোলশেভিকির তৃতীয় আক্রমণ ধর্ম্মের ক্ষেত্রে। প্রাচীনের অতীতের একটা দৃঢ় এবং দারুণ সংস্কার হইতেছে ধর্ম্ম। বোলশেভিকি ভাঙ্গিয়াছে ঐ ধর্ম্ম—অর্থাৎ ধর্ম্মের ঠাট। ধর্ম্মের নামে কত যে কুসংস্কার মানুষকে

পাইয়া বসিয়াছে, তাহার মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিয়াছে, তাহার ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনকে অজ্ঞানে ও দুর্ব্বলতায় পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে তাহা বলিয়া অবশ্যই শেষ করা যায় না। এই ব্যাধিটি যুগ যুগান্তর হইতে, মানুষের আদি উৎপত্তি হইতে চলিয়া আসিয়াছে—সুতরাং ইহার প্রভাব ও প্রসার মানুষের সত্তার, স্বভাবের সাথে এত ওতঃপ্রোত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্ম যে নাই তাহা নয়; নকল আছে বলিয়া আসলকেও উড়াইয়া দেওয়া যায় না—বরং আসল আছে বলিয়াই তাহার নকল সম্ভব। তাই ধর্ম্ম, সত্য ধর্ম্ম আছে, তাই তাহার অনুকরণ তাহার বিকৃত মিথ্যা রূপও আছে—যাহার নাম কুধর্ম্ম বা বিধর্ম্ম। কিন্তু ধর্ম্ম ও বিধর্ম্ম জিনিষ দুইটী বাস্তবে এত মিলিয়া মিশিয়া থাকে, একের নামে অন্যটি এত সহজে চলিয়া যায়—নকল বস্তুটি আসলকে এত শীঘ্রই খেদাইয়া একেশ্বর হইয়া বসে যে বোলশেভিকি সেই গোলমালের পথ দিয়া চলিতেই চায় নাই; বোলশেভিকির বস্তুতন্ত্র মন সেই সূক্ষ্ম সত্য-মিথ্যা নিরূপণে কোন চেষ্টা করে নাই। গীতায় আছে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের কথা। সন্ন্যাসীরা বিকর্ম্মের ভয়ে কর্ম্মকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া অকর্ম্মী হইয়া যায়। সেই রকম বিধর্ম্মের ভয়ে ধর্ম্মকেও বোলশেভিকি বিসর্জ্জন দিয়া উপাসক হইয়াছে অ-ধর্ম্মের। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং যেখানে নিহিতং গুহায়াং সেখানে বিধর্ম্মের হাত এড়াইতে হইলে অ-ধর্ম্মই বরণীয়।

ধর্ম্মকে—অধ্যাত্মকে—বোলশেভিকি গড়ে নাই বা গড়িবার চেষ্টাও করে নাই। কিন্তু কু-ধর্ম্মকে তাহারা যদি ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকে তবে সে কাজ তাহাদের প্রশংসনীয়ই। অবশ্য কু-ধর্ম্মকে উচ্ছেদ করিতে গিয়া সদ্ধর্ম্মের মূলও বোলশেভিকি সমানে উৎপাটিত করিয়াছে। কিন্তু এই রকম কঠোর অস্ত্রোপচারেরও হয়ত প্রয়োজন ছিল। বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম্মের বিকৃতি কি দারুণ রকমের হইতে পারে তাহা দেখিয়া অনেকের ন্যায়তই

সময়ে সময়ে মনে হইতে পারে সেই বিকারকে শোধরাইতে গিয়া যদি সত্যকার ধর্ম্মের উপর কিছু অত্যাচারও হয়, তাহাও স্বীকার করা সহ্য করা ভাল। যেমন ব্যাধি, বোলশেভিকির ঔষধও তেমনি। বিষে বিষক্ষয়। পরে এই বিষপ্রয়োগের একটা প্রতিক্রিয়া আছে বটে, বিষক্ষয় করিয়া সেই স্থান অমৃতে ভরিয়া দিতে হইবে এবং তখন এই বিষ প্রয়োগের কুফল কিছু অনুভব করিতেই হইবে। কিন্তু তাহা পরের কথা, তাহার ব্যবস্থার জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে—ইতিমধ্যে বোলশেভিকির মুষ্টিযোগ হয়ত necessary evil।

বোলশেভিকি এই যে রাষ্ট্রনীতিক, অর্থনীতিক ও ধর্ম্মনীতিক বিপ্লব ঘটাইতেছে তাহা যতই বিপুল হউক না কেন, সেখানে কিন্তু তাহাদের বিশেষত্ব ও নূতনত্ব নয়; এই সকল বিপ্লব অপেক্ষা বৃহত্তর গভীরতর এবং অভিনব বিপ্লব বোলশেভিকি আনিয়াছে, তাহা হইতেছে সামাজিক—সমাজের বাহিরের রূপে কেবল নয় কিন্তু সমাজের মূলতন্ত্রে, মানুষের প্রাণের গড়নে, সংস্কারের ধারায়।

ইউরোপে "রেণাসেন্স" একদিন একটা বিপ্লব আনিয়াছিল। এই বিপ্লব দিয়াই আধুনিক জগতের ও যুগের সূত্রপাত। ইহারই ধারায় চলিয়া পরে ফরাসী বিপ্লব আর একটা তুমুল ভাঙ্গন আনিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল আবার একটা বিশেষ পরিণতি লাভ করিল তৃতীয় আর একটা বিপ্লবে—বিজ্ঞানের বিপ্লবে। বোলশেভিক-বিপ্লব আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী এই তিনটী বিপ্লবের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী। "রেণাসেন্স" বিপ্লব ঘটাইয়াছিল বিশেষভাবে মনের জগতে; কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রার মূলছন্দে, প্রাণের গড়নে বিপর্য্যয় কিছু আনে নাই। ফরাসী-বিপ্লবও এই কাজ করে নাই—ফরাসী বিপ্লব ছিল একটা বিপুল চিন্তাবেগের বন্যা, তাহা প্রাচীনের অনেক জীর্ণ বাহ্যরূপ ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া দিয়াছে, উপরে উপরে সে অনেক ভাঙ্গাচুরা করিয়াছে এবং সর্ব্বত্র সকল ক্ষেত্রে নূতন জীবনের একটা আবেশ বা আভাস চারাইয়া দিলেও সমাজের আসল প্রতিষ্ঠাকে তাহা টলায় নাই, মানুষের মজ্জায় গিয়া তাহা স্পর্শ করে নাই। বিজ্ঞান যে বিপ্লব আনিয়াছে তাহা মানুষকে একেবারে বাহিরের একটা আকস্মিক ওলট পালটের মধ্যে লইয়া ফেলিয়াছে; জীবন যাত্রার যে বাহ্য কাঠাম, দৈনন্দিন প্রয়োজনের যে সাজসরঞ্জাম

তাহাতে এতখানি পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে যে প্রতিক্রিয়ায় বাধ্য হইয়া প্রাণের, স্বভাবের সংস্কারেও একটা আমূল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। এই অবশ্যম্ভাবিতার জোর লইয়া বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে বোলশেভিকির সাধনা।

বোলশেভিকি ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন মানে না, তাহারা চাহে প্রত্যয়-গত, যুক্তিগত, কর্ম্মগত জ্ঞান ; দেবতা নয়, তাহারা চাহে মানুষ—রেণাসেন্স এই পথ দেখাইয়া দিয়াছে, বিজ্ঞানের আবির্ভাব এই সাধনাকেই দিয়াছে পূর্ণ পরিণত রূপ। বোলশেভিকি মানুষের মধ্যেও আবার চাহিয়াছে নেহাৎ সাধারণ মানুষকে, তাহাদের লক্ষ্য জনগণের অভ্যুত্থান, সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর প্রভুত্ব—এই কাজের গোড়াপত্তন করিয়া দিয়াছে ফরাসী বিপ্লব। বোলশেভিকির বৈশিষ্ট্য ঐ দিক দিয়া নয়। ভগবান নাই, আত্মা নাই - বোলশেভিকির এই মন্ত্র নূতন কিছু নয় ; কিন্তু নূতন হইতেছে বোলশেভিকির এই কথা—"বিবাহ নাই"। রাজা নাই, প্রভু নাই, পুরোহিত নাই—ইহা অপেক্ষা বড় হইতেছে বোলশেভিকির এই মন্ত্র, "পিতা নাই, মাতা নাই, পুত্র নাই।" দেশ নাই বা "নেশন" নাই—ইহা অপেক্ষাও সাঙ্ঘাতিক কথা হইতেছে, "গৃহ" নাই।

ফলতঃ সমস্ত অতীতে মানুষের সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে গৃহকে ধরিয়া। গৃহ অর্থাৎ একটি পরিবারের যে ভিটা তাহাকেই আশ্রয় করিয়া মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ জীবন দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। পরিবারই হইল সমাজের মূলরূপ, পারিবারিক সম্বন্ধই সমাজ-বন্ধনের মূলসূত্র। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি—এই সম্বন্ধে সম্বদ্ধ রচিত যত গোষ্ঠী তাহাদের সমষ্টিই হইল সমাজ। আর ঐ সকল সম্বন্ধ তৈয়ার করিয়াছে পরস্পরের মধ্যে যত কর্ত্তব্যের ও অধিকারের বিধি নিষেধ তাহাই লইয়া মানুষের প্রায় সমস্ত নীতি ও ধর্ম্ম, অন্ততঃ ব্যবহারিক জীবন সংক্রান্ত নীতি ও ধর্ম্ম।

অবশ্য ইদানীন্তনকালে সমাজের কেন্দ্র এই পারিবারিক দুর্গ নানাভাবে নানাদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া আসিতেছিল। অন্তরে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের বা স্বৈরতন্ত্রের বিকাশ ও বাহিরে অর্থনীতিক প্রয়োজন—এই দুই শক্তিতে মিলিয়া পরিবারের গাঁথনী অনেক পরিমাণে শিথিল করিয়া তুলিয়াছিল। তবুও মোটের উপরে এই পারিবারিক ভাঙ্গনকে লোকে থামাইতে পারিতেছিল না বলিয়া বেশির ভাগ সহ্য করিয়া আসিতেছিল—জিনিষটিকে আধুনিক জীবনের উপকরণ একটা অনিবার্য্য পাপ হিসাবে স্বীকার করিতেছিল। নানাভাবে সংস্কারের পরিবর্ত্তনের চেষ্টা হইলেও পরিবারই যে সমাজের বনিয়াদ এই তত্ত্বকে আক্রমণ করা হয় নাই। বোলশেভিকি কিন্তু ঐ পরিবারকেই সমাজের পাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলাই উচ্ছেদ সাধন করাই তাহার মতে একমাত্র সমাজসংস্কারের পথ। পারিবারিক ধর্ম্মের নীতির বাধ্যবাধকতা সে নির্ম্মূল করিয়া দিতে চাহিয়াছে।

সমাজ বন্ধনের যে প্রথম সূত্র, স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ—যাহা আমাদের একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য—তাহাই নাকচ করিয়া বোলশেভিকি আরম্ভ করিয়াছে। বোলশেভিকি বলিতেছে (প্রায় উপনিষদ-মন্ত্র প্রতিধ্বনিত করিয়া !), স্ত্রী স্বামীর জন্য নয়, স্বামীও স্ত্রীর জন্য নয়, উভয়েই হইতেছে নিজের নিজের জন্য, অথবা আরও ঠিকভাবে, সমাজের জন্য। এক পুরুষ যে একই নারীকে বরাবর বহন করিবে, বা এক নারী যে একই পুরুষকে চিরকাল ধরিয়া থাকিবে—এই নিয়মের কোন প্রয়োজন কোন সার্থকতা নাই। আর পুরুষ ও নারীর মিলনকে বিবাহ নামক সংস্কারের দ্বারা যে শোধন করাইয়া লইতে হইবেই এমনও কোন বাধ্যবাধকতা নাই ! যাহার সহিত যতদিন ইচ্ছা ঘরকন্না করিতে পার, মিলিতে মিশিতে পার, আবার ইচ্ছা করিলেই তফাৎ হইয়া যাইতে পার।

পুরুষ ও নারী এক সঙ্গে যে হয় তাহার উদ্দেশ্য দুইটি এক শারীর ক্ষুধা মিটাইবার জন্য। এই ক্ষুধাটি পেটের ক্ষুধারই মত এড়াইয়া যাওয়া যায় না, তাই বলিয়া ইহাকে আবার অতিকায় করিয়া তোলাও যুক্তি-যুক্ত নয়। খুব সহজ সাধারণ ভাবেই এই বৃত্তিটিকে দেখিতে হইবে, ইহার ন্যায্য পাওনা সরলভাবে মিটাইয়া চলিবে। আচার অনুষ্ঠান বিধি নিষেধ প্রভৃতি হৈচৈ'র মধ্যে ধরা বাঁধা করিতে গেলে ইহার জোর বাড়াইয়া দেওয়া হয়, ইহাকে অত্যধিক মহত্ত্ব দেওয়া হয়। শরীরের স্বাভাবিক সেবায় দোষ নাই; কিন্তু ইহার গুণটাকেও যেন বড় করিয়া না দেখা হয়। পুরুষ ও নারীর মিলনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—সন্তান-উৎপাদন। এই উদ্দেশ্য হিসাবেই পুরুষ ও নারীর মিলনের যথার্থ প্রয়োজন ও সার্থকতা। তবে কথা এখানেও হইতেছে এই, সন্তান পুরুষের নয়, নারীরও নয়, ইহারা নিমিত্ত মাত্র, সন্তান হইতেছে সমাজের। বোলশেভিকির সমাজে "পিতা" নাই, "মাতা" নাই—সুতরাং "সন্তান"ও নাই। "পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম" অথবা "কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কদাপি নয়" কিম্বা "পুন্নাম নরকাৎ ত্রায়তে" ইত্যাদি নীতিবচনের কোন অর্থ নাই আর বোলশেভিকির শাস্ত্রে। সন্তানকে পিতৃঋণ মাতৃঋণ হইতে বোলশেভিকি মুক্তি দিয়াছে। পিতামাতার উপর সন্তানের লালনপালনের ভার দিলেও এই সর্ত্তে দিয়াছে যে পিতামাতা শুধু হইবে সমাজের প্রতিনিধি, সন্তানের উপরে আসল কর্ত্তৃত্ব তাহাদের কিছু থাকিবে না, তাহাকে নিজেদের ইচ্ছামত গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে পারিবে না। পিতামাতার প্রভাবে সন্তান পাছে বিগড়াইয়া যায়, সেই আশঙ্কায় বোলশেভিকি সন্তানকে পিতা-মাতার নিকট হইতে আলাদা করিয়া লইয়াছে—শিশুদের জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠানই গড়িয়া দিয়াছে এবং তাহাদের লালন পালনের ভার দিয়াছে ধাত্রীর উপর; বড় হইলেও ইহাদের বাসাবাড়ী করিয়া দেওয়া হইয়াছে

বিদ্যালয়ে। গৃহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে—ছেলেরা মেয়েরা সকলে মিলিত হইয়াছে সমাজের বৃহত্তর প্রাঙ্গনে। গুরুজনের আওতায় আবডালে আর তাহারা নাই, তাহারা স্বাধীন স্বতন্ত্র শক্ত সমর্থ হইয়া উঠিতেছে। জন্ম হইতেই আত্মনির্ভরশীল হইতে তাহারা শিখিতেছে, সমাজের জন্য তাহারা প্রত্যেকে এক এক যোদ্ধা হইয়া উঠিয়াছে। পারিবারিক স্নেহমমতা ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি কোমল বৃত্তির—ভাববিলাসের, হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের পরিবর্ত্তে তাহারা অর্জ্জন করিতেছে জীবন যুদ্ধের উপযোগী কঠোরতর সামর্থ্য সব। গৃহের পরিবর্ত্তে বোলশেভিকি চাহিতেছে সৈন্যের ছাউনি।

অন্য কথায়, বোলশেভিকি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে কুলধর্ম্ম, কৌলিক সংস্কার। বস্তুতঃ কিন্তু আধুনিক জগতে কুলধর্ম্মের স্থান হওয়া উচিত নয়। কুলধর্ম্ম সত্যকার জিনিষ ছিল, কুল যখন ছিল সমাজের জীবন্ত সত্য অর্থাৎ সমাজের শৈশব-অবস্থায় (tribal state)। আজ কার্য্যতঃ আমরা সেই সামাজিক স্তর পার হইয়া আসিয়াছি; সমাজ আজ আর কুলগত নয় তাহা হইয়া উঠিয়াছে দেশ বা নেশনগত, দেশকেও ছাড়াইয়া তাহা সমস্ত মানব জাতিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতেছে। বাহিরের সম্মুখের বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে যে জিনিষটি আর নাই, তাহাকে কিন্তু গভীর সংস্কারের অভ্যাসের বশে যেন পিছনের একটা খিড়কী দুয়ার দিয়া ঘরোয়া জীবনের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছি, জিরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছি। সমাজের ভিতরে বাইরে মানুষের প্রাণে ও দেহে মনে সাম্য ও সমন্বয় স্থাপন করিতে হইলে এই প্রাচীনতার নিদর্শন কৌলিক আচার ও সংস্কার সব ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে।

বোলশেভিকির ব্যবস্থা যতই অতিরিক্ত বলিয়া মনে হউক না কেন, আরও একটু গভীর ভাবে দেখিলে তাহার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে এই—

মানুষের সমাজ ও সামাজিক জীবন এ যাবৎ দাঁড়াইয়া আছে রক্তের সম্বন্ধের উপর, বোলশেভিকি এই রক্তের সম্বন্ধ মুছিয়া ফেলিয়া মানুষকে দিতে চাহিতেছে একটা নূতন মিলন-সূত্র, সুতরাং নূতন ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। এক হিসাবে বলিতে পারি রক্তরে সম্বন্ধটি অতি বৃহৎ করিয়া দেখার অর্থ হইতেছে মানুষ যে এককালে ছিল কেবল শারীর জীব বা প্রাণী মাত্র সেই তত্ত্বেরই জের টানিয়া চলা। "Blood is thicker than water"—এই মন্ত্র মানুষের প্রাণে যে গ্রন্থী আঁটিয়া দিয়াছে তাহাই কি মানুষকে বিবর্ত্তনের পথে ক্রমাগতই নীচের দিকে টানিয়া রাখিতেছে না, পুরাতনকেই ফিরাইয়া ফিরাইয়া আনিতেছে না, গতানুগতিকের বাহিরে একটা অভিনব সৃষ্টিকে অসম্ভবই করিয়া রাখিতেছে না? বোলশেভিকি রূঢ় অস্ত্রোপচারে বহু গ্রন্থী কাটিয়া খুলিয়া দিয়াছে, এবং সমাজ যে দৈহিক সম্বন্ধের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নূতনতর সম্বন্ধের অবকাশ ও সম্ভাবনা আনিয়া দিয়াছে।

কিন্তু বোলশেভিকি নিজেরা যে বনিয়াদ খাড়া করিয়াছে, সমাজ বন্ধনের যে মিলনসূত্র দিয়াছে তাহা খুব গভীরের বা সমুচ্চের চেতনা হইতে আসে নাই। বোলশেভিকিরা কুলধর্ম্মকে ভাঙ্গিয়া তাহার পরিবর্ত্তে স্থাপন করিতে চাহিতেছে শ্রেণীধর্ম্ম, রক্তের বন্ধনের পরিবর্ত্তে চাহিতেছে স্বার্থের বন্ধন—প্রয়োজনগত মিতালী (বা Comradeship), প্রাণের টানের পরিবর্ত্তে চাহিতেছে মনের বা মতের মিল। রক্তের বা নাড়ীর সংযোগ অপেক্ষা মনবুদ্ধির যোগ এক হিসাবে উচ্চতর হইতে পারে কিন্তু দৃঢ়তর নয়। উত্তেজনা উচ্ছ্বাস উন্মাদনার যুগে, অসাধারণ অবস্থায় মনবুদ্ধির আদর্শ মানুষকে কিছুদিন চালাইয়া লইতে পারে, তাহার প্রাণের গতিকে একটী নূতন মোড় দিয়া দিতে পারে, কিন্তু জীবনের ধারা সহজ সাধারণ অবস্থায় ফিরিবার সাথে সাথে প্রাণের নিজস্ব সত্য ও ছন্দই

আবার তাহার স্থান করিয়া লয়। এই প্রাণের সত্য ও ছন্দ সম্পূর্ণ জয় করিতে পারে, রূপান্তরিত করিতে পারে মনবুদ্ধির সত্য ও ছন্দ নয় কিন্তু আরও উপরের বৃহত্তর আধ্যাত্মের সত্য ও ছন্দ। এই দিক দিয়া বোলশেভিকি আজ সমাজের যে রূপ দিতে চাহিতেছে, গ্রীস মনীষী প্লেতো বহুপূর্ব্বে তাহার স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার "রিপবলিক" গড়িয়া তুলিবার জন্য প্লেতো প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন সাধারণ জড় বুদ্ধির মানুষ নয়, কিন্তু যাহাদের আছে ঋষির দৃষ্টি ও শক্তি। সে যাহাই হোক, ভাবী সমাজ যাহার হাতেই গঠিত হোক, বোলশেভিকি তাহার রাস্তা একদিক দিয়া কিছু সহজ করিয়া দিয়াছে বই কি। বোলশেভিকি প্রাণ জগতের সত্যের ও ছন্দের যে পরিচিত নামরূপ বা আকার তাহার দুই চারিটী ভাঙ্গিয়া দিয়া মানুষকে দেখাইয়া দিতেছে যে ইহাদের মধ্যে নিত্য কিছু নাই, ইহাদিগকেই ধরিয়া থাকিয়া বলা যায় না এসো ধম্মো সনন্তনো।

আর আর দেশের আর আর জিনিষ গৌরব করিবার আছে—ভারতের এক আছে অন্তরের অধ্যাত্ম পুরুষ। অন্যান্য দেশের অন্তরে তবে কি এই অধ্যাত্ম-পুরুষ আদৌ নাই? থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা আছে সে সব দেশের ব্যক্ত চেতনার বাহিরে—অতলে, অবচেতনার গহ্বরে। পৃথিবীর মধ্যে এক ভারতবর্ষ আপন অধ্যাত্ম-পুরুষের যত কাছে গিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে, তাহার শিক্ষা দীক্ষা তাহার জীবন-ধারার মুলতত্ত্ব সব সজ্ঞানে যতখানি এই আধ্যাত্ম-পুরুষের চেতনায় গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে, এমন আর কোন দেশে সম্ভব হয় নাই। অন্যান্যস্থানে দেখি বাহ্য আধারের বিশেষ এক একটি অঙ্গকে বা উপাঙ্গকে ধরিয়া এক একটি সমষ্টিগত চেতনা তাহার জীবন-সাধনা করিয়া চলিয়াছে; কিন্তু শুধু ভারতেই দেখি, এই সব বিশেষ অঙ্গ উপাঙ্গ গৌণ অবলম্বন মাত্র। অনেক সময়ে তাহারা সম্পূর্ণ অবজ্ঞাতই হইয়াছে—ভারত চাহিয়াছে সকল ক্ষেত্রের সকল বৃত্তির উৎস, আধারের কেন্দ্র যে অন্তর-পুরুষ তাহারই সহিত পরিচিত হইতে।

এই যেমন, ফরাসী জাতির মধ্যে দেখি যে জিনিষটি তাহার বিশেষ সম্পদ তাহা হইতেছে মানস-সংস্কৃতি এবং ইহার ফলে চিন্তার চাতুর্য্য ও সৌষ্ঠব, বাক্-সৃষ্টিতে অর্থাৎ সাহিত্য-রচনায় একটা সহজ দক্ষতা আর তৎসঙ্গে জীবনের ছন্দেও একটা সুষ্ঠু রীতি। অনেক হিসাবেই প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় আধুনিক ফরাসী। আবার ইংরাজ-জাতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে পাই কর্ম্ম-কুশলতা—ইংরাজের মধ্যে মন-বুদ্ধির রাজ্য খুব

বৃহৎ নয়, তাহার আছে একটা চতুর ও সমর্থ প্রাণশক্তি, প্রাণশক্তির এমন একটা গড়ন যাহার আশীর্ব্বাদে কর্ম্মের পথে সে চলে বিনা অপচয়ে, ন্যূনতম ব্যয়ে, একটা সহজ অবাধ গতি লইয়া—দেখিয়া মনে হয় যেন প্রাকৃতিক শক্তির সহিত তাহার কি গোপন সন্ধি হইয়া গিয়াছে যাহার ফলে তাহার কর্ম্মসিদ্ধি হয় বিনা আড়ম্বরে, অথচ অব্যর্থভাবে। কিম্বা আমাদের ঘরের কাছে যদি তাকাই জাপানের দিকে তবে দেখি আর এক দৃশ্য—একটা সমগ্র জাতি কি রকমে, শুধু যথাযোগ্যের, সৌষ্ঠবের নয় একেবারে সুন্দরেরই পূজারী হইয়া উঠিতে পারে তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ এই জাপান। আমরা ভারতবাসী কল্পনাও করিতে পারি না, পদে পদে স্বেচ্ছাচারকে "আমার যা খুসী করিব" ভাবকে বাঁধিয়া বাঁধিয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্যাটার্ণ-অনুযায়ী করিয়া, ঘরদুয়ার আসবাব-পত্র পোষাক-পরিচ্ছদ চাল-চলন প্রতিমুহূর্ত্তে অঙ্কিতে সন্ধিতে শ্রীর—সুন্দরের জাগ্রত বিগ্রহ করিয়া কি রকমে গড়া যায়। আমরা সচরাচর পোষাকী হইতে আটপৌরেতে ফিরিয়া আসিলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি (শুধু কাপড়-চোপড় বিষয়ে নয়, জীবনের বহু ক্ষেত্রেই); জাপানের কিন্তু পোষাকীই হইয়া গিয়াছে তাহার আটপৌরে ধারা।

বিদেশীরা অর্থাৎ পাশ্চাত্যেরা (এবং জাপানীরা পর্য্যন্ত) যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন এখানকার আকার প্রকার দেখিয়া শুনিয়া যে কি পরিমাণ বিরূপ ও বিরক্ত হইয়া পড়েন, তাহা আমরা জানি। এমন কি দেখিতে পাই, ভারতকে জ্ঞানের, সাধনার গুরু বলিয়া যাঁহারা মনে মনে দূর হইতে পূজা করেন, তাঁহারাও ভারতের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ে অনেকখানি হতাশ হইয়া পড়েন। ভারতবাসীর সমষ্টিগত জীবনধারায় বিচ্ছৃঙ্খলতা অপটুতা শ্রীর অভাব, শক্তির অভাব পদে পদে ফুটিয়া উঠিয়াছে; শিক্ষার দিক দিয়া, জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চার দিক দিয়াও ভারত

যে কত পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এমন কি ব্যবহারিক নীতির দিক দিয়াও ভারতের গোষ্ঠি-সত্তার উপর কতখানি নির্ভর করা যায় তাহাও সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

অন্যদিকে আমরাও যখন বিদেশে যাই, তখন কোন্ জিনিষটি দীপ্ত শলাকার মত আমাদের চোখে আসিয়া বিঁধে ? আধুনিক শিক্ষা সভ্যতায় অগ্রণী যে-কোন দেশেই যাই তথায় দেখি সমষ্টিগত জীবনের ধারা পাইয়াছে একটা বিশেষ গতি, একটা স্থির লক্ষ্য—জাতির সমস্ত আয়োজন সমগ্র চেষ্টা সেই এক সাধনার সাথে গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে—সমবেত শক্তির অপব্যবহার যেমন কোথাও নাই, অব্যবহারও নাই। আর আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই জীবনে দেখি একটা বিরাট বিপুল হেলাখেলা—জীবনের কোন ক্ষেত্রে সমগ্র জাতির একটা জোরালো বৈশিষ্ট্য মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই।

অবশ্য বর্ত্তমানের ভারতকে দেখিয়া শুনিয়া সত্যকার ভারত সম্বন্ধে কিছু সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া আর জরাজীর্ণ মৃতকে বা মৃতকল্পকে দেখিয়া তাহার যৌবনের প্রতিভা নির্ণয় করিতে যাওয়া, একই কথা। বাহিরের জীবনে, জীবনের বিশেষ বিশেষ ধারায় ভারতে দেখিবার মত দেখাইবার মত যাহা ছিল একদিন, আজ তাহা সবই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পচিয়া গলিয়া গিয়াছে বা যাইবার মত হইয়াছে। তবুও অতীতের ভারতে, স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবন্ত ভারতের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখি অবশ্য সেখানে তীক্ষ্ণ মনবুদ্ধির, সমর্থ প্রাণশক্তির, শোভন চিত্তের বিকাশ যথেষ্টই হইয়াছিল ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই কথা মনে করিতে পারি না দেশের সমগ্র সাধনা পূর্ণ সার্থকতা তাহার কোন একটির মধ্যে একান্ত হইরা বাঁধা পড়িয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে দেশের যে কৃতি তাহা প্রধানতঃ আবদ্ধ ছিল ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীর মধ্যে, বিশেষ বিশেষ যুগের মধ্যে ; কিন্তু সর্ব্বসাধারণে সর্ব্বকালে যে

বাস্তবকে পরম আপনার বলিয়া চিনিয়াছে জানিয়াছে, অথবা ভারতের যে প্রতিভা শ্রেষ্ঠদের স্রষ্টাদের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার আয়তন সম্পূর্ণ আর এক ধরণের চেতনা।

মনের দেবতা ফরাসীর উপর ভর করিয়াছে, তাই রাসান (Racine) বা ভলতেয়ার (Voltaire) বা আনাতোল ফ্রান্স ফরাসী জাতির চিরন্তন প্রতিভূ হইয়া দাঁড়াইতে পারেন। প্রাণশক্তির দেবতা তাঁহার বরাভয় দিয়াছেন ইংলণ্ডকে তাই রাণী এলিজাবেথ বা নেল্‌সনকে ইংরাজ জাতির প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিলে, কোনই ভুল হইবে না। কিন্তু কালিদাস যত বড় মনীষীই হউন না কেন আর চন্দ্রগুপ্ত যত প্রকাণ্ড কর্ম্মীই হউন না কেন—ভারতের শ্রেষ্ঠ নাম তাঁহারা নহেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ নাম, ভারতের প্রতিনিধি হইতেছেন বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, জনক যাজ্ঞবল্ক্য, শঙ্কর চৈতন্য, রাম ও কৃষ্ণ। ভারতের ঋষি তাই বলিতেছেন, দেহ প্রাণ মন চিত্ত, ইহাদের কেহই নিজের-নিজেরই জন্য কিছু প্রিয় নয়; এসকল জিনিষ যদি প্রিয় হয় তবে ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে যে অন্তর-পুরুষ, তাহারই কল্যাণে ইহারা প্রত্যেকে প্রিয়—আত্মনস্ত কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।

বর্ত্তমান ভারতেও ভারতবাসীর যখন বাহিরের সকলই গিয়াছে—কি দেহে কি প্রাণে কি মনে কি চিত্তে কোথাও কোন শ্রী নাই শক্তি নাই—এখনও যাহা আছে তাহা হইতেছে তাহার অন্তরের অধ্যাত্ম-পুরুষ, তাহার হৃদ-পুরুষ—যেখানে আধারের সকল নাড়ী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ব্যবহারিক জীবন হিসাবে যতই দীন যতই হীন হোক না কেন, আজও ভারতবাসীর মধ্যে এই হৃদপুরুষ যতখানি জাগ্রত জীবন্ত আর কোন দেশের অধিবাসীর মধ্যে তাহা পাই না। অবশ্য এ কথা আমি বলিতেছি না যে ভারতবাসী মাত্রই হইতেছে আধ্যাত্মিকতার অবতার এক এক জন।

দৈনন্দিন জীবনে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহারে হয়ত ইহার বিপরীত প্রমাণই পাওয়া যাইবে। কিন্তু কথাটি তাহা নয়! কথা হইতেছে এই, ভারতবাসীর চেতনায়—উত্তরাধিকারী সূত্রে হোক আর স্বভাবের গুণে হোক—অধ্যাত্মের অতীন্দ্রিয়ের সাধনা এতখানি সহজ হইয়া, জমা হইয়া আছে যে সামান্য একটু সুবিধা অবকাশ বা প্রেরণা পাইবামাত্র সে সামান্য আয়াসেই ঐ সম্পদের অধিকারী হইয়া বসিতে পারে। ভারতের আকাশ বাতাসের তলে তলে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে, ওতঃপ্রোতঃ মিলিয়া মিশিয়া আছে একটা এই অধ্যাত্মসাধনার জগৎ—ভারতবাসীর পক্ষে এই জগতের মধ্যে আসিয়া পড়া অনেকখানিই সহজসাধ্য, শুধু প্রয়োজন কোথাও সামান্য একটু মোড় ঘুরিয়া দাঁড়ান একটা জায়গায় পা খানি দক্ষিণে না ফেলিয়া বাঁয়ে ফেলা বা এই রকম অকিঞ্চিৎকর একটা কিছু অবলম্বন মাত্র। * আর, একবার এই পথে উঠিয়া দাঁড়াইলে তাহাতে যত সহজে সে অগ্রসর হইয়া চলে, আধ্যাত্মের ঠিক ভাবটি যত শীঘ্র সে আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারে ভারতেতর জাতির কেহ সাধারণতঃ তাহা পারিবে না। ভারতবাসীর চেতনায় এপার আর ওপারের মধ্যে বাঁধটি যেন তেমন জমাট কঠিন স্থূল নয়, তাহা একখানি পাতলা স্বচ্ছ পর্দ্দা বা জালের মত—উভয়ের মধ্যে অজানিতে অসাক্ষাতে হোক প্রতিনিয়ত আদান-প্রদান চলিতেছে। সাধারণ একজন ভারতবাসী—এমন কি আধুনিক ইউরোপীয় আলোকে অন্ধ, তথাকথিত শিক্ষিত, কেহ—আপনাকে যতই নিরেট জড়বাদী যুক্তিবাদী কর্ম্মবাদী বলিয়া বিশ্বাস করুন না, আমার মনে হয় তাহার ত্বক একটুখানি চিরিয়া ফেলিলেই ভিতরে দেখিবে ধবক্ ধবক্ করিতেছে ভারতের সনাতন অধ্যাত্মচেতনা, হৃদ-পুরুষের অগ্নি। পক্ষান্তরে একজন

* H. G. Wells এর fourth dimension এর মধ্যে গিয়া পড়িবার মত।

ইউরোপীয়, এমন কি জাপানী পর্য্যন্ত, পরম আস্তিক্য বুদ্ধি লইয়া অতি যত্ন চেষ্টা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিবে চলিবে ফিরিবে অনেকটা শিশুর মত টলিতে টলিতে, আবছায়া বুঝিতে বা না বুঝিতে বুঝিতে।

ভারতকে ভারতবাসীকে তাই সর্ব্বাগ্রে তাহার এই যে স্বধর্ম্ম তাহাতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। ইদানীন্তন কালে আমরা পরধর্ম্মাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি, পরের সম্পদের উপর আমাদের লোভ গিয়া পড়িয়াছে—উপনিষদের শিক্ষা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্। আমরা চাহিতেছি রাষ্ট্রনীতিতে কখন, অর্থনীতিতে কখন, অথবা শিক্ষানীতিতে বিশেষ সিদ্ধি। কিন্তু আমাদের সম্পদ আমাদের বিত্ত আমাদের বৈশিষ্ট্য হইতেছে হৃদয়ের অগ্নিময় পুরুষে - জীবনে, ব্যবহারের ক্ষেত্রেও যদি আমরা সমৃদ্ধি চাই সিদ্ধি চাই, তবুও তাহা আমরা অধিগত করিব এই অন্তর-পুরুষকে আশ্রয় করিয়া, ইহারই প্রতাপে ও প্রতিভায়। ভারতের ঋদ্ধি চিরদিন এই ভাবেই ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতেও অন্য পন্থা নাই।

সম্পূর্ণ

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১১	লোকের	লোকে
১১	১৮	অক্ষন	অক্ষ
১২	১	আর	আজ
১৬	১	লয়াছিল	লইয়াছিল
১৮	৪	অল্ল	অল্প
২২	১৫	who by	who live by
২৪	৪	উপ্রর	উপর
২৫	১০	এজতালি	এজমালি
২৮	১৯	সভা	সত্য
৩৩	২৪	কোন	কেবল
৩৬	২১	তাদিগ	তাগিদ
৩৭	১৯	arts'	art's
৩৮	১৮	সংস্কারের	কুসংস্কারের
,,	,,	কুসংস্কারের	সুসংস্কারের
৪১	৪	সেখার	লেখার
৪২	১	Das capital	Das Capital
,,	৪	করিয়া	কাটিয়া
৪৪	১৭	when	which
৪৫	১৮	ছত্রভন্ন	ছত্রছন্ন
৪৬	২০	একঠা	একটা
৪৮	৫	মত	যত
,,	৮	ধমনীনে	ধমনীতে
,,	১৪	একথা	কথা
,,	১৬	নিমন্ত্রিত	নিয়ন্ত্রিত
,,	৪	বক্তার	রক্তের

পরিশিষ্ট

সোভিয়েট শিক্ষা প্রণালী

বোলশেভিকির শিক্ষা-প্রণালী বোলশেভিকির স্বরূপকে অতি সুন্দর-ভাবে ব্যক্ত করিতেছে—উহারই মধ্যে পাই বোলশেভিকির বিশিষ্ট ধর্ম্ম-কর্ম্মের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যান। এই শিক্ষাপ্রণালীর পরিচয় একটি সত্য ঘটনা* দিয়া আমরা সুরু করিলাম!

রুশের একটি ছোট্ট গ্রাম্য স্কুল। ছেলেরা তাহাদের শিক্ষকটির উপর দারুণ ক্রুদ্ধ। কারণ, তিনি ছেলেদিগকে শাসন করিতে গিয়াছিলেন। ছেলেরা শেষে ছোরা ছুরি লইয়া মাষ্টারকে তাড়া করিল—ভদ্রলোকের সন্তান স্কুল ছাড়িয়া প্রাণ লইয়া পলাইলেন। ছেলেরা তারপর স্কুলের আসবাবপত্রে আগুণ লাগাইয়া তাহাদের বিজয়-উৎসব সম্পন্ন করিল। স্কুলের পরিচালক (প্রধান শিক্ষক) উপরের কর্ম্মচারীর নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া এই সঙ্কটে কি কর্ত্তব্য তাহার নির্দ্দেশ চাহিলেন এবং স্কুলের শৃঙ্খলার জন্য যে তাঁহার আরও ক্ষমতা প্রয়োজন এই নিবেদন জানাইলেন। উপরওয়ালা হাস্য করিয়া বলিলেন, "অন্য পন্থা দেখুন।"—"তাতে যদি কিছু না হয়?"—"তৃতীয় পন্থা দেখিবেন।"—"ও রকম করিয়া কতদূর চলিতে হইবে?"—"যে পর্য্যন্ত আপনি ঠিক পথ না আবিষ্কার করিতে পারেন কিম্বা আপনার ছেলেরা ভাঙ্গা চুরা করিতে করিতে হয়রাণ না হইয়া পড়ে।"

সুখের কথা, প্রধান শিক্ষকের মাথায় হঠাৎ একটা সুবুদ্ধি যোগাইল। তিনি ছেলেদের মধ্যে যাহারা পাণ্ডাগোছের তাহাদিগকে ডাকাইলেন এবং

---

* Bruhns: "The Battle for the Souls of Children in Russia."

তাহাদের লইয়া একটা কমিটি গড়িলেন। তাহাদিগকে ভাল কথায় বুঝাইলেন এবং স্কুলের শান্তি শৃঙ্খলার সকল ভার এই কমিটির উপর ছাড়িয়া দিলেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সকল গোল মিটিয়া স্কুলে অতি চমৎকার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত দেখা দিল।

শোভিয়েট শিক্ষাপ্রণালীর মূলমন্ত্র স্নুতরাং হইতেছে শিক্ষকের শাসন হইতে ছেলেদের সম্পূর্ণ মুক্তি—তাহাদের অবাধ স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতা ; এবং এই উদ্দেশ্যেই স্কুল পরিচালনার এবং শিক্ষা পদ্ধতির নিয়মাবলী রচিত হইয়াছে, যথা—

(১) বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রাখা শিক্ষকদের কাজ নয়, ছেলেদের কাজ।

(২) ছেলেদিগকে কিছু করিতে বারণ করায় বা কোন রকম শাস্তি দেওয়ায় শিক্ষকদের কোন অধিকার নাই।

(৩) ছেলেদের মধ্যে সকল প্রকার রেষারেষি বা প্রতিযোগ নিরসন করিতে হইবে।

(৪) স্কুল ছাড়িবার সময় ছেলেদিগকে শিক্ষকের নিকট হইতে কোন রকম সার্টিফিকেট বা রিপোর্ট লইয়া যে বাহির হইতে হইবে, তাহা নয়।

(৫) স্কুলে ছেলেদের যে নিয়মিত উপস্থিত থাকিতেই হইবে—এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

(৬) শিক্ষক ছেলেদিগকে কোন প্রশ্ন করিবেন না—তাঁহার কাজ শুধু বুঝাইয়া দেওয়া, ছেলেরা যে সব প্রশ্ন করে তাহার উত্তর দিয়ে চলা।

স্নুতরাং আরও দেখিতেছি, সোভিয়েট বিদ্যালয়ে ছেলেরা যে শুধু স্বাধীন তাহাই নয়, তাহারাই কর্তা প্রভু—মাষ্টার ; আর মাষ্টারই হইতেছে বিনীত আজ্ঞাবাহী।

বোলশেভিকির শিক্ষাতন্ত্রের এই গেল একটা দিক। শিক্ষার্থীর উপর বাহির হইতে কোন পীড়ন, কোন শাসন, কোন নিয়ম পর্য্যন্ত আসিবে না—তাহারা নিজেরাই স্বাধীনভাবে নিজেদের পরিচালনার বিধান আবিষ্কার করিবে, স্থাপন করিবে।

একদিকে দেখি এই মুক্তি; কিন্তু অন্যদিকে দেখি ইহার বিপরীত ঠিক তেমনি কঠিন বাঁধন—শাসন এবং পীড়ন; আর সে পীড়ন শাসন বাঁধন আসিয়াছে বাহির হইতেই। ছেলেরা যথা খুসী প্রশ্ন করিয়া যাইবে, শিক্ষকেরা উত্তর দিয়া যাইবেন—সত্য বটে; কিন্তু শিক্ষকদের কি যে উত্তর দিতে হইবে তাহা আগে হইতেই আটে ঘাটে বাঁধা আছে। বোলশেভিকির নিজস্ব যে বিধি ব্যবস্থা, আদর্শ, জীবন সম্বন্ধে জগৎ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত তাহা বা তাহাকে সমর্থন করিতেছে যাহা এমন জিনিষই বালক বালিকা-দিগকে শিখিতে ও জানিতে দিতে হইবে। অন্য রকম সত্যের কথা সযত্নে তাহাদের নিকট হইতে গোপন করিবে অথবা বলিবে এমন ভাবে যে তরুণ মন তাহাদের উপর বিরক্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে; তাহা সব ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ, সমাজের পক্ষে ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে অমঙ্গলজনক ও অপকারী এই জ্ঞানে ও বিশ্বাসে বিষবৎ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারে। ইতিহাস সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান—সকল সাধারণ জ্ঞানের বিষয় পর্য্যন্ত এমন ভাবে কাটিয়া ছাটিয়া এমনভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া ধরিতে হইবে যেন তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় বোলশেভিকির তত্ত্বকে ও তন্ত্রকেই প্রমাণিত করা। এমন একটা আবহাওয়ার মধ্যে তরুণের মন চলিবে ফিরিবে ও বাড়িয়া উঠিবে যে সেখানে কোন সন্দেহ কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না, মানুষের শ্রেষ্ঠতর অন্য আদর্শ অন্য সাধনা কিছু কোথাও আছে বা থাকা সম্ভব। সোভিয়েট তাহার তরুণ সন্তানদের মনকে চেতনাকে এইভাবে একেবারে গোড়া হইতে শক্ত

করিয়া বাঁধিয়া তুলিয়াছে, একটা দৃঢ় গণ্ডীর মধ্যে, একটা বিশেষ আকার দিয়া। স্বাধীন চিন্তা, বুদ্ধির বিচিত্র লীলা, চেতনার স্বচ্ছন্দ গতি বলিয়া কোন রকম জিনিষ বোলশেভিকি রাখিতে চাহে নাই—উহাদিগকে যথা সম্ভব অসম্ভবই করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে।

অবশ্য পৃথিবীতে সকল দেশে সকল রাষ্ট্রে ন্যূনাধিক পরিমাণে এই ধরণের চেষ্টা যে না হইয়াছে তাহা নয়। কিন্তু এক পরাধীন দেশে ছাড়া অন্য কোথাও এই ব্যবস্থাকে সাধারণ শিক্ষার অপরিহার্য্য অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হয় নাই। "সেন্সর" (Censor) নামক বস্তুটি রাজ্য শাসনের, রাষ্ট্রনীতির একটা অস্ত্র; দেশের বিশেষ এক সঙ্কটের অবস্থায় উহার যাহা প্রয়োজন—উহা হইতেছে আপদ্ধর্ম্ম, সাধারণ স্বাভাবিক অবস্থার নিত্য নৈমিত্তিক বিধান বা আদর্শ নয়।

মনের জ্ঞানের রাজ্যের উপর কঠোর বাঁধন ও শাসনকে আদর্শ করিয়া তুলিয়াছিল খৃষ্টীয় চর্চ্চ। সকল রকম জ্ঞানই যে শ্রেয় বা প্রয়োজনীয়, খৃষ্টীয় চর্চ্চ তাহা মানিত না। খৃষ্টীয় চর্চ্চ বলিত, অনেক ধরণের জ্ঞান আছে যাহা ধর্ম্ম সাধনার সমূহ অন্তরায়। ধর্ম্ম সাধনাই মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ; সুতরাং যে সব বিষয় সে পথে বাধা জন্মাইতে পারে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান বা উৎসুক্য না থাকাই ভাল—এ ধরণের অতিজ্ঞান হইতেছে শয়তানের হাতে প্রলোভন। বোলশেভিকির শিক্ষা সাধনা একটা বিশেষ "ধর্ম্ম"-মতেরই শিক্ষা সাধনা; তাই দেখি এই দুই শত্রুর মধ্যে অজ্ঞাতেই একটা সাদৃশ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। রিলিজিয়নের চর্চ্চের পরম বিরোধী হইয়াও বোলশেভিকি তাহার অস্ত্রশস্ত্র তাহার প্রয়োগ-নীতি সম্বন্ধে আপন প্রতিপক্ষেরই হুবহু অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু খৃষ্টীয় চর্চ্চের Inquisition, Papal Bull বা Index expurgationis মানুষের স্বাধীন মনকে বিচিত্র জ্ঞান-স্পৃহাকে পেষণ সত্ত্বেও নষ্ট

করিয়া দিতে পারে নাই—বা মানুষের মধ্যে একটা লোকান্তর জ্ঞানের জ্যোতি নামাইয়া আনিতে পারে নাই। মানুষের মনকে গড়িবার প্রকৃষ্ট পন্থা ইহা নয়। কোন সত্যের উপর মন অচলপ্রতিষ্ঠ তখনই হ'তে পারে যখন সে সত্যকে মন নিজের চেষ্টায় সাধনায় আবিষ্কার করিয়াছে বা স্বেচ্ছায় ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বরণ করিয়া লইয়াছে। বাহির হইতে আরোপ করা হইয়াছে যে সত্য, তাহা যত যত্নে কৌশলে ও শক্ত করিয়াই প্রোথিত করা হোক না—তাহা কখন ঠিক অন্তরের বস্তু হইয়া উঠিবে না, অন্তর হইতে উৎসারিত রস তাহাকে সিঞ্চিত সঞ্জীবিত করিবে না, তাহাতে সহজ অব্যর্থ সমৃদ্ধি সম্ভব হইবে না। বিদেশীর পরধর্ম্মের শাসনের মত, তাহাকে বাহির হইতে যতই সুঠাম ও সুশৃঙ্খল দেখা যাক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা বালির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদমাত্র।

হয়ত বোলশেভিকি তত্ত্ব বলিবে—খৃষ্টীয় চর্চ্চও বলিয়াছে—যে মানুষের মনকে অর্থাৎ ব্যক্তিগত মানুষের মনকে অত বড়, অত সমর্থ কিছু বলিয়া মানিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। মানুষের ও-মন চিরকালই হইতেছে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মার্গগামী, নিজে নিজে সে সত্য আবিষ্কার করিতে পারে না, অথবা এত রকম বিভিন্ন ও বিরোধী সত্যের মধ্যে তাহাকে চলাফিরা করিতে হয়, যে সেখানে সে কোন দিক্ নির্ণয় করিতে পারে না। বিশেষ সত্যকে জীবনে ফলবান রূপবান করিয়া তুলিতে হইলে, মনকে প্রথমে তাহা ধরাইয়া শিখাইয়া দিতে হয়—জোর করিয়াই তাহা মনের উপর চাপাইয়া দিতে হয়, এবং শিক্ষার সময়ে প্রয়োজন মনের চারিদিকে দেউল তুলিয়া দেওয়া, যাহাতে অবান্তর প্রভাব তাহার উপর না পড়িতে পারে। পরে অভ্যাসের পরিচয়ের ফলে সেই সত্যকেই মন আপনার করিয়া লয়।—প্রথমে যাহা বলাৎকার, পরিণামে তাহাই প্রেমে রূপান্তরিত হয়।

সত্য লইয়া বাছাই ও যাচাই করিবার নৈপুণ্য সাধারণ মনের নাই।

খৃষ্টীয় চর্চ্চ ও বোলশেভিকি সে পাট অর্পণ করিয়াছে Revelation এর উপর—একজন আনিয়াছে খৃষ্টের Revelation আর একজন আনিয়াছে লেনিন এর Revelation.

এই যে মনস্তত্ত্ব ইহাতে একটা সত্য কোথাও হয়ত লুকাইয়া আছে—সে সম্বন্ধে পরে কিছু বলিতেছি। কিন্তু ঐ যুক্তি অনুসারে বোলশেভিকি তাহাদের শিক্ষার্থী মণ্ডলীর মধ্যে কর্ম্মশৃঙ্খলা সম্বন্ধে যে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তন করিয়াছে, তাহাও প্রত্যাহার করিতে হয়। সেখানেও এই কথা বলা চলে—প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির মন্ত্র যে ছিল Sparo tho rod and spoil the child, তাহাও এই কথা বলিত—ছেলেদের সহজ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেছে খেয়ালের স্বেচ্ছাচারের অশাসনের উচ্ছৃঙ্খলতার পথে চলা—জোর জবরদস্তি করিয়া তাহাদিগকে নিয়মের বাঁধনে না রাখিলে. তাহারা নিয়মকে মানিবে পছন্দ করিতে শিখিবে না। মনের মত, মানুষের দেহ প্রাণও স্বভাবতঃ স্বৈরচারী—কিছু গড়িয়া তুলিতে হইলেও, সে ক্ষেত্রেও প্রয়োজন দৃঢ় শাসনের ও তাড়নের চাপ।

বোলশেভিকি ব্যবস্থার আসল কথা বোধ হয় ঠিক এই দিক দিয়াই। একটু তলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, বোলশেভিকি যে স্বায়ত্ত শাসন শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই রকম একটা দৃঢ় শাসনের চাপ গড়িয়া তোলা—পার্থক্য শুধু এই সে চাপ বাহির হইতে নয়, কিন্তু গড়িয়া উঠিয়াছে ছেলেদের নিজেদের মধ্যে পরস্পরের আদান প্রদান হইতে। কিন্তু ফলের দিক দিয়া, এই যে বাহিরের ও ভিতরের চাপ, এই দুইয়ের মধ্যে বেশী পার্থক্য আছে কি না সন্দেহ। উভয়েরই লক্ষ্য ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে যথা সম্ভব খাট করিয়া, এমন কি নষ্ট করিয়া দেওয়া। সোভিয়েটের শিক্ষাপ্রণালী কাঁচা বয়স হইতেই তাহার সন্তানদিগকে এইভাবে গড়িয়া তুলিতে চায়, যেন পরস্পরে পরস্পরের

সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলিয়া মিশিয়া একজোট হইয়া তাহারা কাজ করিতে পারে; যাহার যাহা খুসী তেমন চলিতে গেলে, পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ঘটিতে বাধ্য—এই সত্যটি সকলে যেন কার্য্যতঃ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া উপলব্ধি করে এবং প্রত্যেকে আপন আপন ব্যক্তিগত আত্যন্তিক বৈশিষ্ট্য সব যথাসম্ভব কাটিয়া ছাঁটিয়া সমান করিয়া দেয়। শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিগত খেয়ালের অবকাশ নাই—একটা সমষ্টিগত ভাবের চাপ সকল প্রকার idiosyncrisyকে সর্ব্বদা নিরসন করিতেছে। এখানে দলের মানুষ হইতে যাহার আপত্তি, তাহাকে অসামাজিক (unsocial বা antisocial) বলিয়া অবজ্ঞার এমন কি অত্যাচারের পাত্র হইতে হয়, "একঘরে" হইতে হয়। এই উদ্দেশ্যেই সোভিয়েট ছেলেদের মধ্যে কোন রকম প্রতিযোগ আদৌ চায় না। সত্য শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য এবং বোধ হয় সকলের চেয়ে বড় উদ্দেশ্য—প্রত্যেক মানুষের অন্তরাত্মার বিশিষ্ট মহিমাকে প্রস্ফুটিত করিয়া তোলা; বোলশেভিকি সেদিক দিয়া যায় নাই। বোলশেভিকি চাহিয়াছে একটা সুনিয়ন্ত্রিত সুসংহত ঐক্যবদ্ধ সেনাবাহিনী; তবে সেই বাহিনীর নিয়ম শৃঙ্খলা ঐক্য যথাসম্ভব দৃঢ় করিবার জন্য, বাহির হইতে না চাপাইয়া, যাহাতে সৈনিকেরা নিজেরাই নিজের উপর চাপায় সেই শিক্ষা দিতে চাহিয়াছে।

শিক্ষার্থীর জীবনে কর্ম্মক্ষেত্রে এই রকম স্বায়ত্ত শৃঙ্খলা ও শাসন (self discipline) যদি কাম্য হয়, তবে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, মনের জ্ঞানের ক্ষেত্রেও স্বায়ত্ত-আবিষ্কার (self-discovery) কাম্য হইবে না কেন? নিজেরা নিজেরা শাসন করিতে গিয়া যদি অন্তর্দ্রোহ না ঘটাই, মিলন ও ঐক্য স্থাপন করিতে পারি—তবে তেমনি নিজেদেরই সাধনার দ্বারা ভ্রম প্রমাদকে এড়াইয়া সত্য সত্যের কাছে পঁহুছিতে পারিব না কেন? বাহিরের বেলা যে ভয়ের কারণ নাই, অন্তরের সম্পর্কে সে ভয়ের

কারণ আসিবে কোথা হইতে? বলা যাইতে পারে, বাহিরের ক্ষেত্রে বাঁধন ও সংযম আনিয়া দিতেছে অপরের অস্তিত্ব—কিন্তু অন্তরের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই যে নিরঙ্কুশ স্বয়ংসিদ্ধ।

তাই কি? আমার মনে হয়, বাহিরের শৃঙ্খলা বল আর অন্তরের জ্ঞান আহরণ বা সত্য আবিষ্কার বল, উভয়েই পরিণামে নির্ভর করিতেছে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ভিতরের ব্যক্তিগত একটা উচ্চ নিষ্ঠা, একটা আস্থার উপর। শিক্ষার মূল কথাই বোধ হয় এই নিষ্টাকে,এই আস্থাকে জাগ্রত করা, প্রদীপ্ত করা, আর সে কার্য্যটি হইতেছে শিক্ষকের এবং তাহা কেবল সমষ্টি হিসাবে চলিলে সুসম্পন্ন হয় না। প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা নিগূঢ় ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ভিতর দিয়া। এযুগে অবশ্য সেকথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা নির্ভর করে দীক্ষার উপর—শিক্ষার আরম্ভ অন্তরাত্মার বিনিময়। প্রকৃত শিক্ষক—গুরু হইতেছেন তিনি যিনি শিক্ষার্থীর অন্তরাত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহার আপন সম্বুদ্ধ অন্তরাত্মার সহায়ে। সোভিয়েট শিক্ষক কুশলী প্রচারক proselytiser হইতে পারেন; তাঁহার লক্ষ্য একটা দলের মতকে মনোভাবকে প্রতিষ্ঠা করা, তাই তাঁহার লক্ষ্য ব্যক্তিকে লইয়া নয়, কিন্তু মণ্ডলীকে লইয়া। সত্যকার শিক্ষক তাঁহার শিক্ষার্থীকে একটা বিশেষ মতবাদের কাঠামে ঢালিয়া পিটিয়া গড়িতে চাহিবেন না; তাঁহার লক্ষ্য প্রত্যেকের অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করিয়া ধরা, যাহাতে প্রত্যেকেই নিজের অন্তরাত্মার সামর্থ্যে ও স্বাচ্ছন্দ্যে নিজের সত্যের সত্য-আয়তন গড়িয়া তুলিতে পারে। এই রকম স্বরাট্ ব্যক্তির সমষ্টি লইয়াই একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সমৃদ্ধ আদর্শ সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে।

মানুষের অন্তরের জীবনকে কিম্বা বাহিরের জীবনকে চাপের জোরে গড়িয়া তুলিবার অধিকার ও সামর্থ্য এক ভগবানেরই থাকিতে পারে।

তবে বিপদের কথা এই, যেখানে যে কেহ জোর জবরদস্তি করিতে চাহিয়াছে সে'ই আপনাকে ভগবান বা ভাগবত পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে ও প্রচার করিয়াছে, খৃষ্টীয় চর্চ্চের ত ভুলিয়াও এরকম সন্দেহ কখন হয় নাই যে, স্বয়ং ভগবান ছাড়া আর কেহ তাহার বিধি ব্যবস্থা গড়িয়া দিয়াছে ; সে যুগের রাজারাও ভাগবত অধিকারের দোহাই দিয়া শাসন ও পেষণ করিয়া আসিয়াছেন—এযুগে লেনিন্ ও বোলশেভিকরা ভগবানের নাম যদিও করেন নাই, কামে কিন্তু তাঁহারা এই দিক দিয়া খুব ভিন্ন একটা পথে চলেন নাই, কিন্তু ভগবানও স্বয়ং যদি নামিয়া আসেন মানুষকে শাসন করিতে, তবুও সে ক্ষেত্রেও মানুষের নিজের অন্তরাত্মার কিছু বলিবার আছে—ভগবানের শাসন ও মানুষের অন্তরাত্মার সম্মতি অপেক্ষা করে।